আয যারিয়াত

৫১

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ والذاريات থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যা الذاريات শব্দ দ্বারা শুরু হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গী থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, যে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইসলামী আন্দোলনের মোকাবিলা অস্বীকৃতি, ঠাট্টা–বিদ্রূপ ও মিথ্যা অভিযোগ আরোপের মাধ্যমে অত্যন্ত জোরে শোরেই করা হচ্ছিলো ঠিকই কিন্তু তখনো জুলুম ও নিষ্ঠুরতার যাঁতাকলে নিষ্পেষণ শুরু হয়নি, ঠিক সেই যুগে এ সূরাটি নাযিল হয়েছিলো। এ কারণে যে যুগে সূরা ক্বাফ নাযিল হয়েছিলো এটিও সে যুগের নাযিল হওয়া সূরা বলে প্রতীয়মান হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর অধিকাংশটাই জুড়ে আছে আখেরাত সম্পর্কিত আলোচনা এবং শেষভাগে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করা হয়েছে। সাথে সাথে মানুষকে এ বিষয়েও হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে যে, নবী–রসূলদের (আ) কথা না মানা এবং নিজেদের জাহেলী ধ্যান–ধারণা আকড়ে ধরে একগুঁয়েমি করা সেসব জাতির নিজেদের জন্যই ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হয়েছে যারা এ নীতি অবলম্বন করেছিলো।

এ সূরার ছোট ছোট কিন্তু অত্যন্ত অর্থপূর্ণ আয়াতসমূহে আখেরাত সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে, মানব জীবনের পরিণাম ও পরিণতি সম্পর্কে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী আকীদা–বিশ্বাস পোষণ করে। এটাই প্রমাণ করে যে, এসব আকীদা–বিশ্বাসের কোনটিই জ্ঞানগত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। প্রত্যেকেই নিজের অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে নিজনিজ অবস্থানে যে মতবাদ গড়ে নিয়েছে সেটাকেই সে তার আকীদা–বিশ্বাস বানিয়ে আঁকড়ে ধরেছে। কেউ মনে করে নিয়েছে, মৃত্যুর পরে কোন জীবন হবে না। কেউ আখেরাত মানলেও জন্মান্তর বাদের ধারণা সহ মেনেছে। কেউ আখেরাতের জীবন এবং পুরস্কার ও শাস্তির কথা বিশ্বাস করলেও কর্মের প্রতিফল থেকে বাঁচার জন্য নানা রকমের সহায় ও অবলম্বন কল্পনা করে নিয়েছে। যে বিষয়ে ব্যক্তির সিদ্ধান্ত ভুল হলে তার গোটা জীবনকেই ব্যর্থ এবং চিরদিনের জন্য তার ভবিষ্যতকে ধ্বংস

করে দেয় এমন একটি বড় ও সর্বাধিক গুরুত্বহ মৌলিক বিষয়ে জ্ঞান ছাড়া শুধু অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে কোন আকীদা–বিশ্বাস গড়ে নেয়া একটি সর্বনাশা বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। এর অর্থ হলো, মানুষ একটি বড় ভ্রান্তিতে ডুবে থেকে গোটা জীবন জাহেলী ঔদাসীন্যে কাটিয়ে দেবে এবং মৃত্যুর পর হঠাৎ এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে যার জন্য সে আদৌ প্রস্তুতি গ্রহণ করেনি। এরূপ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটিই মাত্র পথ আছে, তা হচ্ছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নবী আখেরাত সম্পর্কে যে জ্ঞান দান করছেন সে বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ধীর মস্তিষ্কে গভীরভাবে ভেবে দেখবে এবং আসমান ও যমীনের ব্যবস্থাপনা এবং নিজের সত্তা সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করে উন্মুক্ত চোখে দেখবে যে, চার পাশে সেই জ্ঞানটির যথার্থতার স্বপক্ষে প্রমাণ বিদ্যমান আছে কিনা? এ ক্ষেত্রে বাতাস ও বৃষ্টির ব্যবস্থাপনা, পৃথিবীর গঠনাকৃতি এবং তার সৃষ্টিকূল, মানুষ নিজে, আসমানের সৃষ্টি এবং পৃথিবীর সকল বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করাকে আখেরাতের প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে এবং মানবেতিহাস থেকে উদাহরণ পেশ করে বলা হয়েছে যে, একটা কর্মফল ব্যবস্থা থাকা যে অত্যাবশ্যক এটা এ বিশ্ব–সাম্রাজ্যের স্বভাব–প্রকৃতির স্বতস্ফূর্ত দাবী বলেই প্রতীয়মান হয়।

এরপর অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করে বলা হয়েছে তোমাদের স্রষ্টা তোমাদেরকে অন্যদের বন্দেগী ও দাসত্বের জন্য সৃষ্টি করেননি, বরং নিজের বন্দেগী ও দাসত্বের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদের মিথ্যা উপাস্যদের মত নন। তোমাদের মিথ্যা উপাস্যরা তোমাদের থেকে রিযিক গ্রহণ করে এবং তোমাদের সাহায্য ছাড়া তাদের প্রভুত্ব অচল। তিনি এমন উপাস্য যিনি সবার রিযিকদাতা। তিনি কারো নিকট থেকে রিযিক গ্রহণের মুখাপেক্ষী নন এবং নিজ ক্ষমতাবলেই তার প্রভুত্ব চলছে।

এ প্রসঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, যখনই নবী–রসূলদের বিরোধিতা করা হয়েছে, তা যুক্তির ভিত্তিতে না করে একগুঁয়েমি, হঠকারিতা এবং জাহেলী অহংকারের ভিত্তিতে করা হয়েছে। ঠিক যেমনটি আজ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে করা হচ্ছে। অথচ এর উৎস ও চালিকা শক্তি বিদ্রোহাত্মক মনোভাব ছাড়া আর কিছুই নয়। অতপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেন তিনি এসব বিদ্রোহীদের আদৌ ভ্রূক্ষেপ না করেন এবং নিজের দাওয়াত ও নসীহতের কাজ চালিয়ে যান। কারণ, তা এ লোকদের কোন উপকারে না আসলেও ঈমানদারদের জন্য অবশ্যই উপকারে আসবে। কিন্তু যেসব জালেম তাদের বিদ্রোহের ওপর অটল তাদের প্রাপ্য শাস্তি প্রস্তুত হয়ে আছে। কারণ, তাদের পূর্বে এ নীতি ও আচরণ অবলম্বনকারী জালেমরাও তাদের প্রাপ্য আযাব পুরোপুরি লাভ করেছে।

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ﴿١﴾ فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ﴿٢﴾ فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ﴿٣﴾ فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا ﴿٤﴾ اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ﴿٥﴾ وَّاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ﴿٦﴾ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ﴿٧﴾ اِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ﴿٨﴾ يُّؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ ﴿٩﴾

শপথ সে বাতাসের যা ধূলাবালি উড়ায়। আবার পানি ভরা মেঘরাশি বয়ে নিয়ে যায়[১] তারপর ধীর মৃদুমন্দ গতিতে বয়ে যায়। অতপর একটি বড় জিনিস (বৃষ্টি) বন্টন করে।[২] প্রকৃত ব্যাপার হলো, তোমাদেরকে যে জিনিসের ভীতি প্রদির্শন করা হচ্ছে[৩] তা সত্য। কর্মফল প্রদানের সময় অবশ্যই আসবে।[৪]

শপথ বিবিধ আকৃতি ধারণকারী আসমানের।[৫] (আখেরাত সম্পর্কে) তোমাদের কথা পরস্পর ভিন্ন।[৬] তার ব্যাপারে সে-ই বিরক্ত যে হকের প্রতি বিমুখ।[৭]

১. এ ব্যাপারে সমস্ত তাফসীরকার একমত যে, الذاريات অর্থ বিক্ষিপ্তকারী ও ধূলাবালি ছড়ানো বাতাস এবং الحملت وقرا (ভারী বোঝা বহনকারী) অর্থ সেই বাতাস যা সমুদ্র থেকে লক্ষ কোটি গ্যালন বাষ্প মেঘের আকারে বহন করে আনে। হযরত উমর, হযরত আলী, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রো, মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবায়ের, হাসান বাসরী, কাতাদা ও সুদ্দী প্রমুখ মুফাস্‌সিরগণের থেকে বর্ণত হয়েছে।

২. اَلْجَارِيَاتِ يُسْرًا ও اَلْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا এর ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সিগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কেউ এ কথাটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন বা এ অর্থ গ্রহণ করা জায়েয মনে করেছেন যে, এ দু'টি বাক্যাংশের অর্থও বাতাস। অর্থাৎ এ বাতাসই আবার মেঘমালা বহন করে নিয়ে যায় এবং ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহর নির্দেশানুসারে যেখানে যতটুকু বর্ষণের নির্দেশ দেয়া হয় ততটুকু পানি বন্টন করে। আরেক দল اَلْجَارِيَاتِ يُسْرًا আয়াতাংশের অর্থ করেছেন দ্রুতগতিশীল নৌকাসমূহ এবং اَلْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا অর্থ করেছেন সেসব ফেরেশতা যারা আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তাঁর সমস্ত সৃষ্টির জন্য বরাদ্দকৃত জিনিস তাদের মধ্যে বন্টন করে। একটি রেওয়ায়াত অনুসারে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ দু'টি আয়াতাংশের এ অর্থ বর্ণনা করে বলেছেন, আমি এ

অর্থ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে না শুনে থাকলে বর্ণনা করতাম না। এর ওপর ভিত্তি করে আল্লামা আলূসী এ ধারণা প্রকাশ করেন যে, এটি ছাড়া এ আয়াতাংশ দু'টির আর কোন অর্থ গ্রহণ করা জায়েয নয়। যারা অন্য কোন অর্থ গ্রহণ করেছেন তারা অনর্থক দুঃসাহস দেখিয়েছেন। কিন্তু হাফেয ইবনে কাসীর বলেন, এ রেওয়ায়াতের সনদ দুর্বল এবং এর ওপর ভিত্তি করে অকাট্যভাবে বলা যায় না যে, নবী (সা) সত্যিই এসব আয়াতাংশের এ ব্যাখ্যাই বর্ণনা করেছেন। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, সাহাবা ও তাবেয়ীদের একটি উল্লেখযোগ্য দল কর্তৃক এ দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাফসীরকারদের বড় দল প্রথম তাফসীরটিও বর্ণনা করেছেন। আর কথার ধারাবাহিকতার সাথে এ অর্থটিই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। শাহ রাফীউদ্দিন সাহেব, শাহ আবদুল কাদের সাহেব এবং মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেবও তাঁদের অনুবাদে প্রথম অর্থটিই গ্রহণ করেছেন।

৩. মূল আয়াতে تُوْعَدُوْنَ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটি যদি মূল ধাতু وَعد থেকে গঠিত হয়ে থাকে তাহলে তার অর্থ হবে তোমাদেরকে যে বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে, আর যদি وعِيد থেকে গঠিত হয়ে থাকে তাহলে অর্থ হবে, "তোমাদেরকে যে জিনিসের ভয় দেখানো হচ্ছে।" ভাষাগতভাবে দু'টি অর্থই যথাযথ ও নির্ভুল। কিন্তু প্রয়োগ ক্ষেত্রের সাথে দ্বিতীয় অর্থটিই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, যারা কুফর, শিরক ও পাপাচারে ডুবে ছিল এবং কখনো নিজ কৃতকর্মের প্রতিফল পেতে হবে এবং সে জন্য জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে একথা মানতে প্রস্তুত ছিল না এখানে তাদেরকে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে। এ কারণে আমরা تُوْعَدُوْنَ শব্দটিকে প্রতিশ্রুতি অর্থে গ্রহণ না করে ভীতি অর্থে গ্রহণ করেছি।

৪. এটাই সেই মূল কথা যে জন্য শপথ করা হয়েছে। এ শপথের অর্থ হচ্ছে, যে নজিরবিহীন শৃঙ্খলা ও নিয়মতান্ত্রিকতার সাথে বৃষ্টিপাতের এ মহা ব্যবস্থাপনা তোমাদের চোখের সামনে চলছে এবং তার মধ্যে যে যুক্তি, কৌশল ও উদ্দেশ্য সক্রিয় দেখা যাচ্ছে তা প্রমাণ করছে যে, এ পৃথিবী কোন উদ্দেশ্যহীন ও অনর্থক বালু মাটির খেলাঘর নয় যেখানে লক্ষ কোটি বছর থেকে উদ্দেশ্যহীনভাবে অতি বড় একটা খেলা চলছে, বরং প্রকৃতপক্ষে এটা একটা পরিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা যেখানে প্রতিটি কাজ কোন না কোন উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা সামনে রেখে হচ্ছে। এ ব্যবস্থাপনায় কোনক্রমেই এটা সম্ভব নয় যে, এখানে মানুষের মত একটা সৃষ্টিকে বিবেক বুদ্ধি, চেতনা–বিবেচনা, বাছ–বিচার কর্মের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব খাটানোর অধিকার দিয়ে তার মধ্যে ভাল ও মন্দের নৈতিক অনুভূতি সৃষ্টি করে এবং তাকে সব রকম ন্যায় ও অন্যায় এবং ভুল ও নির্ভুল কাজ করার সুযোগ দিয়ে পৃথিবীতে যথেচ্ছা আচরণ করার জন্য একেবারে উদ্দেশ্যহীনভাবে ছেড়ে দেয়া হবে এবং তাকে কখনো একথা জিজ্ঞেস করা হবে না যে, তাকে যে মন–মগজ ও দৈহিক শক্তি দেয়া হয়েছিল, পৃথিবীতে কাজ করার জন্য যে ব্যাপক উপায়–উপকরণ তার হাতে ন্যস্ত করা হয়েছিল এবং আল্লাহর অসংখ্য সৃষ্টির ওপর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব খাটানোর যেসব ইখতিয়ার তাকে দেয়া হয়েছিল তা সে কিভাবে ব্যবহার করেছে। যে বিশ্ব–ব্যবস্থায় সবকিছুর পেছনেই একটা উদ্দেশ্য কার্যকর সেখানে শুধু মানুষের মত একটি মহাসৃষ্টির আবির্ভাব কিভাবে উদ্দেশ্যহীন হতে পারে? যে ব্যবস্থায় প্রতিটি জিনিস জ্ঞান ও যুক্তি নির্ভর

সেখানে শুধুমাত্র মানুষের সৃষ্টি অর্থহীন হতে পারে কি করে? যেসব সৃষ্টির জ্ঞান-বুদ্ধি ও বোধশক্তি নেই এ বস্তুজগতেই তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যায়। এ কারণে তাদের আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ার পর যদি তাদের ধ্বংস করে দেয়া হয় তাহলে তা যথাযথ ও যুক্তিসংগত। কারণ তাদেরকে কোন ক্ষমতা ও ইখতিয়ার দেয়া হয়নি। তাই তাদের জবাবদিহিরও কোন প্রশ্ন নেই। কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধি, চেতনা ও বিবেক এবং ক্ষমতা-ইখতিয়ারের অধিকারী সৃষ্টি—যার কাজ-কর্ম শুধু বস্তুজগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং যার নৈতিক প্রভাবও আছে এবং যার নৈতিক ফলাফল সৃষ্টিকারী কাজ-কর্মের ধারাবাহিকতা শুধু জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চলে না, মৃত্যুর পরও তার নৈতিক ফলাফল উদ্ভব হতে থাকে এমন সৃষ্টিকে শুধু তার বস্তুগত তৎপরতা শেষ হয়ে যাওয়ার পর উদ্ভিদ ও জীব-জন্তুর মত কি করে ধ্বংস করা যেতে পারে? সে তার নিজের ক্ষমতা ও ইচ্ছায় যে নেক কাজ বা বদ কাজই করে থাকুক না কেন তার সঠিক ও ন্যায়সংগত প্রতিদান তার অবশ্যই পাওয়া উচিত। কারণ যে উদ্দেশ্যে তাকে অন্যসব সৃষ্টির মত না করে ক্ষমতা ও ইখতিয়ার সম্পন্ন সৃষ্টি হিসেবে বানানো হয়েছে এটা তার মৌলিক দাবী। তাকে যদি জবাবদিহি করতে না হয়, তার নৈতিক কাজ-কর্মের জন্য যদি পুরস্কার ও শাস্তি না হয় এবং ক্ষমতা ও ইখতিয়ারবিহীন সৃষ্টিকূলের মত স্বাভাবিক জীবন শেষ হওয়ার পর তাকে ধ্বংস করে দেয়া হয় তাহলে তাকে সৃষ্টি করা অবশ্যই অর্থহীন হবে। কিন্তু একজন মহাজ্ঞানী ও বিচক্ষণ স্রষ্টার কাছে এরূপ নিরর্থক কাজের আশা করা যায় না।

এ ছাড়াও আখেরাত এবং পুরস্কার ও শাস্তি সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে সৃষ্টির এ চারটি নিদর্শনের নামে শপথ করার আরো একটি কারণ আছে। আখেরাত অস্বীকারকারীরা যে কারণে মৃত্যুর পরের জীবনকে অসম্ভব মনে করে তা এই যে, মৃত্যুর পর আমরা যখন মাটিতে বিলীন হয়ে যাবো এবং আমাদের অণু-পরমাণু যখন মাটিতে বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়বে তখন কি করে সম্ভব যে, দেহের এসব বিক্ষিপ্ত অংশ পুনরায় একত্রিত হবে এবং পুনরায় আমাদেরকে সৃষ্টি করা হবে। আখেরাতের প্রমাণ হিসেবে সৃষ্টির যে চারটি নিদর্শনকে পেশ করা হয়েছে সেগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে আপনা থেকেই এ সন্দেহ ও ভ্রান্তি দূর হয়ে যায়। ভূপৃষ্ঠের যতগুলো পানির ভাণ্ডারে সূর্যের কিরণ পৌঁছে ততগুলো পানির ভাণ্ডারে সূর্যের তাপ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় পানির অগণিত বিন্দু তার ভাণ্ডারে পড়ে না থেকে শূন্যে উড়ে যায়। কিন্তু তা নিঃশেষ হয়ে যায় না, বরং বাষ্পে রূপান্তরিত হয়ে প্রতিটি বিন্দু বাতাসের মধ্যে সংরক্ষিত থাকে। অতপর আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে এ বাতাসই বাষ্পে রূপান্তরিত ঐ সব বারিবিন্দুকে একত্রিত করে গাঢ় মেঘের সৃষ্টি করে, ঐ মেঘরাশিকে নিয়ে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সময় নির্ধারিত আছে ঠিক সেই সময় প্রতিটি বিন্দুকে ঠিক সেই আকৃতিতে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয় যে আকৃতিতে তা পূর্বে ছিল। প্রতিনিয়ত এই যে দৃশ্য মানুষের চোখের সামনে অতিক্রান্ত হচ্ছে তা সাক্ষ্য দেয় যে, মৃত মানুষদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও আল্লাহর একটি মাত্র ইংগিতে একত্রিত হতে পারে এবং ঐ সব মানুষ আগে যেমন ছিল ঠিক সেই আকৃতিতেই তাদেরকে পুনরায় জীবিত করা যেতে পারে। এসব অংগ-প্রত্যংগ মাটি, বাতাস বা পানি যার মধ্যেই মিশে যেয়ে থাক না কেন সর্বাবস্থায়ই তা এ পৃথিবী এবং এর পরিমণ্ডলেই আছে। যে আল্লাহ পানি থেকে বাষ্পরাশি তৈরী করে তা বাতাসের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার পর পুনরায় সেই বাতাসের সাহায্যেই তা

একত্রিত করেন, এবং পরে পানির আকারে তা বর্ষণ করেন, তাঁর জন্য মানব-দেহের অংগ-প্রত্যংগকে বাতাস, পানি ও মাটির মধ্য থেকে বেছে একত্রিত এবং পূর্বের মত সংযোজিত করে দেয়া কঠিন হবে কেন?

৫. মূল আয়াতে ذَاتِ الْحُبُكِ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। حُبُك রাস্তাসমূহ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। বায়ু প্রবাহের কারণে মরুভূমির বালুকারাশি এবং বদ্ধ পানিতে যে ঢেউ সৃষ্টি হয় তাকেও বলে। আবার কোঁকড়া চুলে যে গুচ্ছ ও ভাঁজের সৃষ্টি হয় তা বুঝানোর জন্যও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এখানে আসমানকে حُبُك এর অধিকারী বলার কারণ হচ্ছে যে, অধিকাংশ সময় আসমানে নানা আকৃতির মেঘরাশি ছেয়ে থাকে এবং বাতাসের প্রভাবে বারবার তার আকৃতি পরিবর্তিত হতে থাকে এবং কখনো কোন আকৃতি না স্থায়িত্ব লাভ করে না অন্য আকৃতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়। অথবা এ কারণে বলা হয়েছে যে, রাতের বেলা যখন আকাশে তারকাসমূহ চড়িয়ে থাকে তখন মানুষ তার নানা রকম আকৃতি দেখতে পায় যাঁর কোনটি অন্যগুলোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয় না।

৬. এ ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্যের ব্যাপারে বিভিন্ন আকৃতির আসমানের শপথ করা হয়েছে উপমা হিসেবে। অর্থাৎ আসমানের মেঘমালা ও তারকাপুঞ্জের আকৃতি যেমন ভিন্ন এবং তাদের মধ্যে কোন সাদৃশ্য ও মিল দেখা যায় না, তোমরাও আখেরাত সম্পর্কে অনুরূপ রকমারি মতামত ও বক্তব্য পেশ করছো এবং তোমাদের একজনের কথা আরেকজনের থেকে ভিন্ন। তোমাদের কেউ বলে এ পৃথিবী অনাদি ও চিরস্থায়ী। তাই কোন রকম কিয়ামত সংঘটিত হতে পারে না। কেউ বলে, এ ব্যবস্থা ধ্বংসশীল এবং এক সময় এটা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তবে মানুষসহ যেসব জিনিস ধ্বংস হয়ে গিয়েছে তার পুনরুজ্জীবন সম্ভব নয়। কেউ পুনরুজ্জীবনকে সম্ভব বলে মনে করে কিন্তু তার আকীদা-বিশ্বাস এই যে, মানুষ তার ভাল কাজের ফলাফল ভোগের জন্য এ পৃথিবীতে বারবার জন্ম নেয়। কেউ জান্নাত এবং জাহান্নামও বিশ্বাস করে, কিন্তু তার সাথে আবার জন্মান্তরবাদেরও সমন্বয় সাধন করে অর্থাৎ তার ধারণা হচ্ছে গোনাহগার ব্যক্তি জাহান্নামেও শাস্তি ভোগ করে এবং এ পৃথিবীতেও শাস্তি পাওয়ার জন্য বারবার জন্ম লাভ করতে থাকে। কেউ বলে, দুনিয়ার এ জীবনটাই তো একটা শাস্তি। মানবাত্মার যতদিন পর্যন্ত বস্তু জীবনের সাথে সম্পর্ক থাকে ততদিন পর্যন্ত মরে মরে পুনরায় এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে থাকে। তার প্রকৃত মুক্তি (নির্বান লাভ) হচ্ছে অস্তিত্বহীন হয়ে যাওয়া। কেউ আখেরাত এবং জান্নাত ও জাহান্নাম বিশ্বাস করে ঠিকই, কিন্তু বলে, আল্লাহ তাঁর একমাত্র পুত্রকে ক্রুশে মৃত্যু দান করে মানুষের সর্বকালের গোনাহর কাফ্ফারা আদায় করে দিয়েছেন। মানুষ আল্লাহর সেই পুত্রের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নিজের কুকর্মের মন্দ পরিণতি থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে। কিছু লোক আছে যারা আখেরাত এবং শাস্তি ও পুরস্কারে বিশ্বাস করেও এমন কিছু বুযর্গ ব্যক্তিকে সুপারিশকারী মনে করে নেয়—তাদের ধারণায় তারা আল্লাহর এতই প্রিয় বা আল্লাহর কাছে এমন ক্ষমতার অধিকারী যে, যারাই তাদের ভক্ত হয়ে যাবে তারা পৃথিবীতে সবকিছু করেও শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে। এসব সম্মানিত সত্তা সম্পর্কে এ আকীদা পোষণকারীদের মধ্যে মতের মিল নেই। প্রত্যেক গোষ্ঠীই তাদের নিজেদের আলাদা আলাদা সুপারিশকারী বানিয়ে রেখেছে। মতের এ ভিন্নতাই প্রমাণ করে যে, অহী ও রিসালাতের তোয়াক্কা না করে মানুষ তার নিজের এবং এ পৃথিবীর পরিণতি সম্পর্কে

قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ ﴿١٠﴾ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ ﴿١١﴾ يَسْـَٔلُوْنَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿١٢﴾ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ ﴿١٣﴾ ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ ۖ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿١٤﴾ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿١٥﴾ اٰخِذِيْنَ مَاۤ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ ۗ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ﴿١٦﴾

ধ্বংস হয়েছে অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা,[৮] যারা অজ্ঞতায় নিমজ্জিত এবং গাফলতিতে বিভোর।[৯] তারা জিজ্ঞেস করে, তবে সেই কর্মফল দিবস কবে আসবে? তা সেদিন আসবে যেদিন তাদের আগুনে ভাজা হবে।[১০] (এদের বলা হবে) এখন তোমাদের ফিতনার[১১] স্বাদ গ্রহণ করো। এটা সেই বস্তু যার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করছিলে।[১২] তবে মুত্তাকীরা[১৩] সেদিন বাগান ও ঝর্ণাধারার মধ্যে অবস্থান করবে। তাদের রব যা কিছু তাদের দান করবেন তা সানন্দে গ্রহণ করতে থাকবে।[১৪] সেদিনটি আসার পূর্বে তারা ছিল সৎকর্মশীল।

যখনই কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তা অজ্ঞতা প্রসূত হয়েছে। অন্যথায়, মানুষের কাছে সত্যিই যদি এ ব্যাপারে সরাসরি জ্ঞানলাভের কোন মাধ্যম থাকতো তাহলে এত ভিন্ন ভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী আকীদা-বিশ্বাস সৃষ্টি হতো না।

৭. মূল আয়াতের বাক্য হলো يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ । এ আয়াতাংশে ব্যবহৃত عَنْهُ সর্বনাম দ্বারা দু'টি জিনিস বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। এক, কৃতকর্মের প্রতিদান। দুই, ভিন্ন ভিন্ন কথা ও বক্তব্য। প্রথম ক্ষেত্রে এ বাণীর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, কৃতকর্মের প্রতিদান অবশ্যই সামনে আসবে, যদিও তোমরা সে প্রতিদান প্রাপ্তি সম্পর্কে নানা রকমের ভিন্ন ভিন্ন আকীদা পোষণ করে থাকো। তবে তা মেনে নিতে কেবল সেই ব্যক্তিই বিদ্রোহ করে যে ন্যায় ও সত্য বিমুখ। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এ বাণীর অর্থ দাঁড়ায় এই নানা রকমের বক্তব্য ও মতামত দেখে কেবল সেই ব্যক্তিই বিভ্রান্ত হয় যে ন্যায় ও সত্যের প্রতি বিমুখ।

৮. এ বাক্যটি দ্বারা কুরআন মজীদ মানুষকে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সত্য সম্পর্কে সাবধান করছে। পার্থিব জীবনের ছোট ছোট ক্ষেত্রে অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে কোন পরিমাপ ও মূল্যায়ণ করা কিছুটা চলতে পারে যদিও তা জ্ঞানের বিকল্প হতে পারে না। কিন্তু গোটা জীবনের কৃতকর্মের জন্য কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে কিনা এবং যদি করতে হয় তাহলে কার কাছে কখন জবাবদিহি আমাদেরকে করতে হবে? সেই জবাবদিহিতে আমাদের সফলতা ও ব্যর্থতার ফলাফল কি হবে? এটা এমন কোন প্রশ্ন নয় যে, এ সম্পর্কে মানুষ শুধু অনুমান ও ধারণা অনুসারে একটা কিছু ঠিক করে নেবে এবং জুয়ার বাজি ধরার মত নিজের জীবনরূপ পুঁজির সবটাই বাজি ধরে বসবে। কারণ, এ

অনুমান যদি ভ্রান্ত হয় তাহলে তার অর্থ হবে, ব্যক্তি নিজেকেই নিজে ধ্বংস করে ফেললো। তাছাড়া মানুষ যেসব বিষয়ে শুধু অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে পারে এটি আদৌ সে ধরনের নয়। কারণ, যা মানুষের ধরা–ছোঁয়ার গণ্ডির মধ্যে কেবল সেসব ক্ষেত্রেই অনুমান চলতে পারে। কিন্তু এটি এমন একটি বিষয় যার কোনকিছুই ধরা–ছোঁয়ার গণ্ডিভুক্ত নয়। তাই এর কোন অনুমান ভিত্তিক মূল্যায়ণ সঠিক হতে পারে না। এখন প্রশ্ন থাকে তাহলে অনুভূতি ও উপলব্ধির বাইরের এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঠিক উপায় কি? কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় এ প্রশ্নের যে জবাব দেয়া হয়েছে এবং এ সূরা থেকেও এ জওয়াবেরই ইংগিত পাওয়া যায় যে, মানুষ নিজে সরাসরি ন্যায় ও সত্য পর্যন্ত পৌছতে পারে না। আল্লাহ তাঁর নবীর মাধ্যমে ন্যায় ও সত্যের জ্ঞান দান করে থাকেন। এ জ্ঞানের সত্যতা সম্পর্কে মানুষ তার নিজের সন্তুষ্টি বিধান করতে পারে এভাবে যে, যমীন, আসমান ও তার নিজের মধ্যে যে অসংখ্য নিদর্শন বিদ্যমান তা গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে নিরপেক্ষভাবে ভেবে দেখবে যে, নবী যা বলছেন এসব নিদর্শন কি সেই সত্যই প্রমাণ করছে, না এ বিষয়ে অন্যেরা যেসব ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ পেশ করেছে সেগুলোকেই সমর্থন করছে? আল্লাহ ও আখেরাত সম্পর্কে জ্ঞানগত বিশ্লেষণের এটিই একমাত্র পন্থা যা কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। এ পন্থা বাদ দিয়ে যে ব্যক্তিই নিজের আন্দাজ–অনুমান অনুসারে চলেছে সে–ই ধ্বংস হয়েছে।

৯. অর্থাৎ তারা জানে না যে, নিজেদের এ ভুল মূল্যায়ণের কারণে তারা কোন্ পরিণামের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কেউ এভাবে মূল্যায়ণ করে যে পথই অবলম্বন করেছে তা তাকে সোজা ধ্বংসের গহবরে নিয়ে গেছে। যে ব্যক্তি আখেরাত অস্বীকার করে সে কোন প্রকার জবাবদিহির জন্য আদৌ প্রস্তুতি গ্রহণ করছে না, এবং এ চিন্তায় মগ্ন আছে যে, মৃত্যুর পরে আর কোন জীবন হবে না। কিন্তু সেই সময়টি আকস্মিকভাবে এসে হাজির হবে যখন তার আশা–আকাংখা ও চিন্তা–ভাবনার সম্পূর্ণ বিপরীত আরেকটি জীবনে তার চোখ খুলবে এবং সে জানতে পারবে যে, এখানে তাকে এক এক করে প্রতিটি কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। যে ব্যক্তি এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে গোটা জীবন অতিবাহিত করছে যে, মৃত্যুর পর পুনরায় এ দুনিয়ায় ফিরে আসবো, সে মৃত্যুর সাথে সাথে জানতে পারবে যে, এখন ফিরে যাওয়ার সব দরজা বন্ধ। নতুন কোন কাজের দ্বারা অতীত জীবনের কাজের ক্ষতিপূরণের কোন সুযোগই আর এখন নেই এবং সামনে আরো একটি জীবন আছে যেখানে চিরদিনের জন্য তাকে নিজের পার্থিব জীবনের কর্মফল দেখতে ও ভোগ করতে হবে। যে ব্যক্তি এ আশায় নিজের জীবনকে ধ্বংস করে ফেলে যে, যদি নফস এবং তার প্রবৃত্তিসমূহকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেলি তাহলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে আমি দৈহিক আযাব থেকে রক্ষা পেয়ে যাবো। কিন্তু মৃত্যুর দরজা পার হওয়া মাত্রই সে দেখতে পাবে সামনে ধ্বংস নেই আছে শুধু চিরস্থায়ী জীবন ও অস্তিত্ব। আর তাকে এখন এ বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে যে, তোমাকে জীবন ও অস্তিত্বের নিয়ামত কি এ জন্যই দেয়া হয়েছিলো যে, তুমি তাকে গড়ার ও সুসজ্জিত করার পরিবর্তে ধ্বংস করার জন্য নিজের সমস্ত শ্রম ব্যয় করবে? অনুরূপ যে ব্যক্তি তথাকথিত কোন ঈশ্বর পুত্রের কাফ্ফারা হওয়ার কিংবা কোন বুযর্গ ব্যক্তির শাফায়াতকারী হওয়ার ভরসায় সারা জীবন আল্লাহর নাফরমানী করতে থাকলো আল্লাহর সামনে হাজির হওয়া মাত্র সে জানতে পারবে যে, এখানে না কেউ কারো কাফ্ফারা আদায়কারী আছে, না কারো এমন শক্তি আছে যে

নিজের শক্তিতে অথবা নিজে কারো ভালবাসায় ধন্য হওয়ার কারণে কাউকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে। অতএব, অনুমান ভিত্তিক এসব আকীদা-বিশ্বাস প্রকৃতপক্ষে এক আফিম, যার নেশায় এসব লোক বুঁদ হয়ে আছে। তারা জানে না আল্লাহ ও নবী-রসূল প্রদত্ত সঠিক জ্ঞানকে উপেক্ষা করে এরা যে মূর্খতার মধ্যে নিমগ্ন আছে তা তাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।

১০. প্রতিদান দিবস কবে আসবে কাফেরদের এ প্রশ্ন আসলে প্রকৃত তথ্য জানার জন্য ছিল না, বরং তা ছিল-বিদ্রূপ ও হাসি ঠাট্টার উদ্দেশ্যে। তাই তাদেরকে এ ভঙ্গিতে জবাব দেয়া হয়েছে। এটা ঠিক সেরূপ যখন আপনি কোন ব্যক্তিকে দুষ্কর্ম থেকে বিরত থাকার জন্য উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন, একদিন এ আচরণের খারাপ পরিণতি দেখতে পাবে। কিন্তু সে বিদ্রূপ করে আপনাকে জিজ্ঞেস করছে ঃ জনাব, কবে আসবে সেদিন? সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, "খারাপ পরিণতি কবে আসবে" তার এ প্রশ্ন সেই খারাপ পরিণতি আসার তারিখ জানার জন্য নয়। বরং আপনার উপদেশকে বিদ্রূপ করার জন্য। সুতরাং এর সঠিক জবাব হবে এই যে, তা সেদিন আসবে যেদিন তোমার দুর্ভাগ্য আসবে। এখানে একথাটিও ভালভাবে বুঝে নেয়া দরকার যে, আখেরাত অস্বীকারকারী কোন ব্যক্তি যদি ভদ্রতা ও যুক্তি সহকারে বিতর্ক করে তাহলে সে এর স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দিয়ে কথা বলতে পারে। কিন্তু তার মস্তিষ্ক খারাপ না হলে সে এ প্রশ্ন কখনো করতে পারে না যে, আখেরাত কোন্ তারিখে সংঘটিত হবে তা বলো। তার পক্ষ থেকে যখনই এ ধরনের প্রশ্ন আসবে, বিদ্রূপ ও হাসি-তামাশা হিসেবেই আসবে। তাই আখেরাত সংঘটিত হওয়া না হওয়ার তারিখ বলে দেয়াতে মূল বিষয়ের ওপর কোন প্রভাবই পড়ে না। কেউ এ কারণে আখেরাত অস্বীকার করে না যে, তা সংঘটিত হওয়ার সন, মাস এবং দিন বলে দেয়া হয়নি। আবার তা অমুক সন, অমুক মাস ও অমুক তারিখে সংঘটিত হবে তা শুনে কেউ তা মেনে নিতে পারে না। তারিখ নির্দিষ্ট করে বলে দেয়া আদৌ কোন প্রমাণ নয় যে, তা কোন অস্বীকারকারীকে স্বীকার করে নিতে আগ্রহী করে তুলবে। কারণ, এরপরে এ প্রশ্নও দেখা দেয় যে, ঐ দিনটি আসার আগে কিভাবে বিশ্বাস করা যায় যে, সেদিন সত্যি সত্যিই তা সংঘটিত হবে।

১১. এখানে 'ফিত্না' শব্দটি দু'টি অর্থ প্রকাশ করছে। একটি অর্থ হচ্ছে, নিজের এ আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো। অপর অর্থটি হচ্ছে, তোমরা পৃথিবীতে যে বিভ্রান্তির ধুম্রজাল সৃষ্টি করে রেখেছিলে তার স্বাদ গ্রহণ করো। আরবী ভাষায় এ শব্দটির এ দু'টি অর্থ গ্রহণের সমান অবকাশ আছে।

১২. "তাহলে প্রতিদানের সেদিনটি কবে আসবে" কাফেরদের এ প্রশ্নে এ অর্থও বহন করছিলো যে, তা আসতে বিলম্ব হচ্ছে কেন? আমরা যখন তা অস্বীকার করছি এবং তার অস্বীকৃতির শাস্তি আমাদের জন্য অনিবার্য হয়ে পড়েছে তখন তা আসছে না কেন? এ কারণে তারা যখন জাহান্নামের আগুনে দগ্ধিভূত হতে থাকবে তখন বলা হবে, এটি সেই জিনিস যা তোমরা দ্রুত কামনা করছিলে। এ আয়াতাংশ থেকে স্বতই এ অর্থ প্রকাশ পায় যে, এটা নিছক আল্লাহর করুণা ছিল যে, তোমাদের অবাধ্যতা প্রকাশের সাথে সাথে তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করেননি। বরং তোমাদেরকে ভেবে-চিন্তে দেখার, বুঝার এবং নিজেকে সামলে নেয়ার জন্য তিনি দীর্ঘ অবকাশ দিয়ে এসেছেন। কিন্তু তোমরা এমন নির্বোধ

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ⑰ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ⑱ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ⑲ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ⑳ وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ㉑ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ㉒ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ㉓

রাতের বেলা তারা কমই ঘুমাতো।[১৫] তারপর তারাই আবার রাতের শেষ প্রহরগুলোতে ক্ষমা প্রার্থনা করতো।[১৬] তাদের সম্পদে অধিকার ছিল প্রার্থী ও বঞ্চিতদের।[১৭] দৃঢ় প্রত্যয় পোষণকারীদের জন্য পৃথিবীতে বহু নিদর্শন রয়েছে।[১৮] এবং তোমাদের সত্তার মধ্যেও।[১৯] তোমরা কি দেখ না? আসমানেই রয়েছে তোমাদের রিযিক এবং সে জিনিসও যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হচ্ছে।[২০] তাই আসমান ও যমীনের মালিকের শপথ, একথা সত্য এবং তেমনই নিশ্চিত যেমন তোমরা কথা বলছো।

যে, সে অবকাশ থেকে উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে সে সময়টি যেন দ্রুত নিয়ে আসা হয় সেই দাবী করে এসেছো। এখন দেখে নাও, যে জিনিসের দ্রুত আগমন কামনা করছিলে তা কেমন জিনিস।

১৩. এখানে 'মুত্তাকী' শব্দটি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করছে যে, এর অর্থ সেসব লোক যারা আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রসূলের দেয়া খবরের প্রতি বিশ্বাস করে আখেরাতকে মেনে নিয়েছে এবং আখেরাতের জীবনের সফলতার জন্য তাদেরকে যে আচরণ করতে বলা হয়েছিলো তারা তাই করেছিলো এবং যে আচরণ ও নীতি সম্পর্কে বলে দেয়া হয়েছিলো যে, তা আল্লাহর আযাবের মধ্যে নিমজ্জিত করে তা বর্জন করেছিলো।

১৪. যদিও আয়াতের মূল বাক্যাংশ হচ্ছে أٰخِذِيْنَ مَا اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ এবং যার শাব্দিক অনুবাদ শুধু এই যে, "তাদের রব যা দিবেন তা তারা নিতে থাকবে।" কিন্তু এ ক্ষেত্রে নেয়ার অর্থ শুধু নেয়া নয়, বরং সানন্দচিত্তে নেয়া। যেন কোন দানশীল ব্যক্তি কিছু লোককে হাতে তুলে পুরস্কার দিচ্ছেন আর তারা লাফালাফি করে তা নিচ্ছে। কোন ব্যক্তিকে যখন তার পছন্দের জিনিস দেয়া যায় সে মুহূর্তে নেয়ার মধ্যে আপনা থেকেই সানন্দে নেয়ার অর্থ সৃষ্টি হয়ে যায়। কুরআন মজীদে একস্থানে বলা হয়েছে ঃ

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ

"মানুষ কি জানে না, আল্লাহই তো বান্দার তাওবা কবুল করেন এবং তাদের সাদকা গ্রহণ করেন। (তাওবা ঃ ১০৪)

এখানে সাদকা গ্রহণ করার অর্থ তা শুধু নেয়া নয়, বরং সন্তুষ্ট হয়ে তা গ্রহণ করা।

১৫. মুফাস্‌সিরদের এক দল এ আয়াতের যে অর্থ গ্রহণ করেছেন তা হচ্ছে তারা শুধু শুয়ে শুয়ে সারারাত কাটিয়ে দিত এবং রাতের প্রারম্ভে, মধ্যভাগে বা শেষভাগে কম হোক বা বেশী হোক কিছু সময় জেগে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করে কাটাতো না, এমন খুব কমই ঘটতো। হযরত ইবনে আব্বাস, আনাস ইবনে মালেক, মুহাম্মাদ আল বাকের, মাতরাফ ইবনে আবদুল্লাহ, আবুল আলিয়া, মুজাহিদ, কাতাদা, রাবী' ইবনে আনাস প্রমুখ থেকে সামান্য শাব্দিক তারতম্য সহ এ তাফসীরই বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় দল এর অর্থ বর্ণনা করেছেন এই যে, তারা রাতের বেশীর ভাগ সময়ই মহান আল্লাহর ইবাদাতে কাটাতেন এবং অল্প সময় ঘুমাতেন। এটা হযরত হাসান বাসরী, আহনাফ ইবনে কায়েস এবং ইবনে শিহাব যুহরীর বক্তব্য। পরবর্তীকালের মুফাস্‌সির ও অনুবাদকগণ এ ব্যাখ্যাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারণ, আয়াতের শব্দসমূহ এবং তার প্রয়োগের ক্ষেত্র বিবেচনায় এ ব্যাখ্যাই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয়। সুতরাং অনুবাদেও আমরা এই অর্থ গ্রহণ করেছি।

১৬. অর্থাৎ যারা তাদের রাতসমূহ পাপ-পঙ্কিলতা ও অশ্লীল কাজ-কর্মে ডুবে থেকে কাটায় এবং তারপরও মাগফিরাত প্রার্থনা করার চিন্তাটুকু পর্যন্ত তাদের মনে জাগে না এরা তাদের শ্রেণীভুক্ত ছিল না। পক্ষান্তরে এদের অবস্থা ছিল এই যে, তারা রাতের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আল্লাহর ইবাদাতে ব্যয় করতো এবং এরপরও রাতের শেষাংশে আপন প্রভুর কাছে এই বলে ক্ষমা প্রার্থনা করতো যে, তোমার যতটুকু ইবাদাত বন্দেগী করা আমাদের কর্তব্য ছিল তা করতে আমাদের ত্রুটি হয়েছে। هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ কথাটির মধ্যে এ বিষয়েও একটি ইংগিত আছে যে, তাদের জন্য এ আচরণই শোভনীয় ছিল। তারাই ছিল আল্লাহর দাসত্বের এরূপ পরাকাষ্ঠা দেখাবার যোগ্য যে আল্লাহর বন্দেগীতে জীবনপাতও করবে এবং তা সত্ত্বেও এ জন্য কোন রকম গর্বিত হওয়া এবং নিজের নেক কাজের জন্য অহংকার করার পরিবর্তে নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমার জন্য বিনীতভাবে প্রার্থনা করবে। যারা গোনাহ করার পরও বুকটান করে চলে সে নির্লজ্জ পাপীদের আচরণ এরূপ হতে পারতো না।

১৭. অন্য কথায় একদিকে তারা এভাবে তাদের প্রভুর অধিকার স্বীকার ও আদায় করতো, অন্যদিকে আল্লাহর বান্দাদের সাথে তাদের আচরণ ছিল এই। কম হোক বা বেশী হোক আল্লাহ তাদের যা কিছুই দান করেছিলেন তাতে তারা কেবল নিজেদের এবং নিজেদের সন্তান-সন্ততির অধিকার আছে বলে মনে করতো না বরং তাদের মধ্যে এ অনুভূতিও ছিল যে, যারা তাদের সাহায্যের মুখাপেক্ষী এমন প্রত্যেক আল্লাহর বান্দার তাদের সম্পদে অধিকার আছে। আল্লাহর বান্দাদের সাহায্য তারা দান-খয়রাত হিসেবে করতো না। তাই তারা তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রত্যাশী ছিল না কিংবা তাদেরকে নিজেদের অনুগ্রহের পাত্র মনে করতো না। একে তারা তাদের অধিকার মনে করতো এবং নিজেদের কর্তব্য মনে করে পালন করতো। তাছাড়া যারা প্রার্থী হয়ে তাদের কাছে এসে সাহায্যের জন্য হাত পাততো শুধু এসব লোকের মধ্যেই তাদের সমাজ সেবা সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং যার সম্পর্কেই তারা জানতে পারতো যে, সে তার রুটি রুজি অর্জন করা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছে তাকেই সাহায্য করার জন্য তারা অস্থির হয়ে পড়তো। যে ইয়াতীম শিশু অসহায় হয়ে পড়েছে, যে বিধবার কোন আশ্রয় নেই, যে অক্ষম ব্যক্তি নিজের

রুজি–রোজগারের জন্য চেষ্টা–সাধনা করতে পারে না, যে ব্যক্তি বেকার ও কর্মহীন হয়ে পড়েছে কিংবা যার উপার্জন প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট হচ্ছে না, যে ব্যক্তি কোন দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে এবং নিজে নিজের ক্ষতিপূরণে সক্ষম নয়, মোট কথা এমন অভাবী যে কোন ব্যক্তির অবস্থা তার গোচরীভূত হয়েছে সে তার সাহায্য লাভের অধিকার স্বীকার করেছে। সে তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেছে।

এ তিনটি বিশেষ গুণের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে 'মুত্তাকী ও মুহসিন' বলে আখ্যায়িত করে বলছেন, এ গুণাবলীই তাদেরকে জান্নাতলাভের অধিকারী বানিয়েছে।

প্রথম গুণটি হচ্ছে, তারা আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করেছেন এবং এমন প্রতিটি আচরণ বর্জন করেছেন আল্লাহ ও তাঁর রসূল যাকে আখেরাতের জীবনের জন্য ধ্বংসাত্মক বলে বর্ণনা করেছিলেন। দ্বিতীয় গুণটি হচ্ছে, তারা নিজেদের জীবনপাত করে আল্লাহর বন্দেগীর হক আদায় করেছেন এবং সে জন্য অহংকার প্রকাশ করার পরিবর্তে ক্ষমা প্রার্থনাই করেছেন। তৃতীয় গুণটি হলো, তারা আল্লাহর বান্দাদের সেবা ইহসান মনে করে করেননি, বরং তাদের অধিকার ও নিজেদের কর্তব্য মনে করে করেছেন।

এখানে একথাটিও জেনে নেয়া দরকার যে, ঈমানদারদের অর্থ–সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের যে অধিকারের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তার অর্থ যাকাত নয় যা শরীয়াতের নির্দেশ অনুসারে তাদের ওপর ফরয করে দেয়া হয়েছে। যাকাত আদায় করার পরও আর্থিক সংগতি সম্পন্ন একজন ঈমানদার তার অর্থ–সম্পদে অন্যদের যে অধিকার আছে বলে উপলব্ধি করে এবং শরীয়াত বাধ্যতামূলক না করে থাকলেও সে মনের একান্ত আগ্রহ সহকারে তা আদায় করে; এখানে সে অধিকারের কথা বলা হয়েছে। ইবনে আব্বাস মুজাহিদ এবং যায়েদ ইবনে আসলাম প্রমুখ মনীষীগণ এ আয়াতটির এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর এ বাণীটির সারকথা হলো, একজন মুত্তাকী ও পরোপকারী মানুষ কখনো এরূপ ভ্রান্ত ধারণায় নিমজ্জিত হয় না যে, তার সম্পদে আল্লাহ ও তাঁর বান্দার যে অধিকার ছিল যাকাত আদায় করে সে তা থেকে পুরোপুরি অব্যাহতি লাভ করেছে। ভুখা, নাংগা ও বিপদগ্রস্ত প্রতিটি মানুষকেই সাধ্যমত সাহায্য করে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা সে স্বীকার করে। আল্লাহর মুত্তাকী ও মুহসিন বান্দা তার সাধ্যমত পরোপকারমূলক কাজ করতে সর্বদা মনে প্রাণে প্রস্তুত থাকে এবং পৃথিবীতে নেক কাজ করার যে সুযোগই সে লাভ করে তা হাতছাড়া হতে দেয় না। সে কখনো এরূপ চিন্তা–ভাবনা করে না যে, যে নেক কাজ করা তার জন্য ফরয করে দেয়া হয়েছিলো তা সে সম্পাদন করেছে, এখন আর কোন নেক কাজ সে কেন করবে?

যে ব্যক্তি নেক কাজের মূল্য বুঝতে পেরেছে সে তা বোঝা মনে করে বরদাশত করেনা, বরং নিজের লাভজনক ব্যবসায় মনে করে আরো অধিক উপার্জনের জন্য লালায়িত হয়ে পড়ে।

১৮. নিদর্শন অর্থ সেসব নিদর্শন যা আখেরাতের সম্ভাবনা এবং তার অবশ্যম্ভাবিতা ও অনিবার্যতার সাক্ষ দিচ্ছে। পৃথিবীর অস্তিত্ব এবং তার গঠন ও আকার–আকৃতি সূর্য থেকে তাকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে এবং বিশেষ কোণে স্থাপন, তার ওপর উষ্ণতা ও আলোর ব্যবস্থা করা, সেখানে বিভিন্ন মওসূম, ঋতুর আগমন ও প্রস্থান, তার ওপর বাতাস

ও পানি সরবরাহ করা, তার অভ্যন্তর ভাগে নানা রকমের অগণিত সম্পদের ভাণ্ডার সরবরাহ করা, তার উপরিভাগ একটি উর্বর আবরণ দিয়ে মুড়ে দেয়া এবং তার পৃষ্ঠদেশে ভিন্ন ভিন্ন রকমের অসংখ্য ও অগণিত উদ্ভিদরাজি উৎপন্ন করে দেয়া, তাতে স্থল, জল ও বায়ুতে বিচরণকারী জীবজন্তু ও কীট–পতঙ্গের অসংখ্য প্রজাতির বংশধারা চালু করা, প্রত্যেক প্রজাতির জীবন ধারণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ও উপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করা, সেখানে মানুষকে অস্তিত্ব দানের পূর্বে এমন সব উপায়–উপকরণের ব্যবস্থা করা যা ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়ে কেবল তার দৈনন্দিন প্রয়োজনই পূরণ নয় বরং তার তাহযীব তামাদ্দুনের ক্রমবিবর্তনের ক্ষেত্রে সহযোগিতাও করতে থাকবে, এসব এবং এ ধরনের এত অগণিত নির্দশনাদি আছে যে, চক্ষুষ্মান ব্যক্তি পৃথিবী ও এর পরিমণ্ডলে যে দিকেই দৃষ্টিপাত করে তা তার মনকে আকৃষ্ট করতে থাকে। যে ব্যক্তি তার বিবেক–বুদ্ধির দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, কোনক্রমেই বিশ্বাস করতে চায় না, তার কথা ভিন্ন। সে এর মধ্যে আর সবকিছুই দেখতে পাবে। কিন্তু দেখবে না শুধু সত্যের প্রতি ইংগিত প্রদানকারী কোন নিদর্শন। তবে যার হৃদয়–মন সংকীর্ণতা ও পক্ষপাত মুক্ত এবং সত্যের জন্য অবারিত ও উন্মুক্ত সে এসব জিনিস দেখে কখনো এ ধারণা পোষণ করবে না যে, এসবই কয়েকশ' কোটি বছর পূর্বে বিশ্ব–জাহানে সংঘটিত একটি আকস্মিক মহা বিস্ফোরণের ফল। বরং এসব দেখে তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাবে যে, এ চরম উন্নত মানের এ বৈজ্ঞানিক কীর্তি মহা শক্তিমান ও মহাজ্ঞানী এক আল্লাহরই সৃষ্টি। যে আল্লাহ এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তিনি যেমন মৃত্যুর পরে পুনরায় মানুষকে সৃষ্টি করতে অক্ষম হতে পারেন না, তেমনি এমন নির্বোধ হতে পারেন না যে, তাঁর পৃথিবীতে বুদ্ধি–বিবেক ও উপলব্ধির অধিকারী একটি সৃষ্টিকে স্বাধীনতা ও এখতিয়ার দিয়ে লাগামহীন বলদের মত ছেড়ে দিবেন। স্বাধীনতা ও ইখতিয়ারের অধিকারী হওয়ার স্বতস্ফূর্ত ও অনিবার্য দাবী হলো জবাবদিহি। জবাবদিহির ব্যবস্থা না থাকলে স্বাধীনতা ও এখতিয়ার যুক্তি ও ইনসাফের পরিপন্থী হবে। আর অসীম শক্তির বিদ্যমানতা স্বভাবতই একথা প্রমাণ করে যে, পৃথিবীতে মানবজাতির কাজ শেষ হওয়ার পর সে যেখানেই মরে পড়ে থাকুক না কেন যখন ইচ্ছা তার মহাশক্তিধর স্রষ্টা জবাবদিহির জন্য সমস্ত মানুষকে পৃথিবীর প্রতিটি কোণ থেকে পুনরুজ্জীবিত করে আনতে সক্ষম।

১৯. অর্থাৎ বাইরে দেখারও প্রয়োজন নেই। শুধু নিজের মধ্যে দেখলেই তুমি এ সত্য প্রমাণকারী অসংখ্য নিদর্শন দেখতে পাবে। কিভাবে একটি অণুবীক্ষণিক কীট এবং অনুরূপ একটি অণুবীক্ষণিক ডিম্বকে মিলিয়ে একত্রিত করে মাতৃদেহের একটি নিভৃত কোণে তোমাদের সৃষ্টির সূচনা করা হয়েছিল। অন্ধকার সেই নিভৃত কোণে কিভাবে লালন পালন করে তোমাদেরকে ক্রমান্বয়ে বড় করা হয়েছে। কিভাবে তোমাদেরকে অনুপম আকৃতি ও কাঠামোর দেহ এবং বিস্ময়কর কর্মশক্তি সম্পন্ন প্রাণ শক্তি দেয়া হয়েছে। কিভাবে তোমাদের দেহাবয়বের পূর্ণতা প্রাপ্তি মাত্রই তাকে মাতৃগর্ভের সংকীর্ণ ও অন্ধকার জগত থেকে বের করে এ বিশাল ও বিস্তৃত জগতে এমন সময় আনা হয়েছে যখন তোমাদের মধ্যে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র স্থাপিত হয়েছে। এ যন্ত্র তোমাদের জন্ম থেকে যৌবন ও বার্ধক্য পর্যন্ত শ্বাস গ্রহণ করা, খাদ্য পরিপাক করা, রক্ত তৈরী করে শিরা উপশিরায় প্রবাহিত করা, মল নির্গমন করা, দেহের ক্ষয়িত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত অংশসমূহ আবার নির্মাণ করা ভিতর থেকে উদ্ভূত কিংবা বাইরে থেকে আগমনকারী বিপদাপদ–

সমূহের প্রতিরোধ করা, ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করা এমনকি পরিশ্রান্ত হওয়ার পর আরামের জন্য শুইয়ে দেয়ার কাজ পর্যন্ত আপনা থেকেই সম্পন্ন করে যাচ্ছে। জীবনের এ মৌলিক প্রয়োজনসমূহ পূরণের জন্য তোমাদের মনোযোগ ও চেষ্টা–সাধনার সামান্যতম অংশও ব্যয়িত হয় না। তোমাদের মাথার খুলির মধ্যে একটি বিস্ময়কর মস্তিষ্ক বসিয়ে দেয়া হয়েছে যার জটিল ভাঁজে ভাঁজে জ্ঞান–বুদ্ধি, চিন্তা–ভাবনা, কল্পনা, উপলব্ধি, ন্যায়–অন্যায় বোধ, ইচ্ছা, স্মৃতিশক্তি, আকাংখা, অনুভূতি, আবেগ, ঝোঁক ও প্রবণতা এবং আরো অনেক শক্তির এক বিশাল ভাণ্ডার কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে আছে। তোমাদেরকে জ্ঞান অর্জন করার অনেক মাধ্যম দেয়া হয়েছে যা চোখ, নাক, কান এবং গোটা দেহের স্নায়ুতন্ত্রীর সাহায্যে তোমাদেরকে সব রকমের সংবাদ পৌছিয়ে থাকে। তোমাদেরকে ভাষা এবং বাকশক্তি দেয়া হয়েছে যার সাহায্যে তোমরা নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে পার। সর্বোপরি তোমাদের সত্তার এ গোটা সাম্রাজ্যের ওপর তোমার আমিত্ব বা অহংকে নেতা বানিয়ে বসিয়ে দেয়া হয়েছে যাতে সবগুলো শক্তি কাজে লাগিয়ে মতামত গঠন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পার যে, কোন্ পথে তোমাদের সময়, শ্রম ও চেষ্টা–সাধনা ব্যয় করতে হবে, কোন্‌টি বর্জন করতে হবে এবং কোন্‌টি গ্রহণ করতে হবে, কোন্ বস্তুকে নিজের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ বানাতে হবে এবং কোন্‌টিকে নয়।

একটু লক্ষ করো এরূপ একটি সত্তা বানিয়ে তোমাদেরকে যখন পৃথিবীতে আনা হলো তখনই তোমাদের সত্তার লালন–পালন, প্রবৃদ্ধি, উন্নতি ও পূর্ণতা সাধনের জন্য কত সাজ–সরঞ্জাম এখানে প্রস্তুত পেয়েছো। এসব সাজ–সরঞ্জামের বদৌলতে জীবনের একটি পর্যায়ে পৌছে তোমরা নিজেদের ক্ষমতা ইখতিয়ার কাজে লাগানোর উপযুক্ত হয়েছো।

এসব ক্ষমতা ইখতিয়ার কাজে লাগানোর জন্য পৃথিবীতে তোমাদেরকে নানা উপায়–উপকরণ দেয়া হয়েছে, সুযোগ দেয়া হয়েছে, বহু জিনিসের ওপর তোমাদের কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। বহু মানুষের সাথে তোমরা নানা ধরনের আচরণ করেছো। তোমাদের সামনে কুফরী ও ঈমান, পাপাচার ও আনুগত্য, জুলুম ও ইনসাফ, নেকী ও কুকর্ম এবং হক ও বাতিলের সমস্ত পথ খোলা ছিল। এসব পথের প্রত্যেকটির দিকে আহবানকারী এবং প্রত্যেকটির দিকে নিয়ে যাওয়ার মত কার্যকারণসমূহ বিদ্যমান ছিল। তোমাদের মধ্যে যে–ই যেপথ বেছে নিয়েছে নিজের দায়িত্বেই বেছে নিয়েছে। কারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাছাই করার ক্ষমতা তার মধ্যে পূর্ব থেকেই দেয়া ছিলো। প্রত্যেকের নিজের পছন্দ অনুসারে তার নিয়ত ও ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপায়িত করার যে সুযোগ সে লাভ করেছে তা কাজে লাগিয়ে কেউ সৎকর্মশীল হয়েছে এবং কেউ দুষ্কর্মশীল হয়েছে। কেউ কুফরী, শিরক ও নাস্তিকতার পথ গ্রহণ করেছে। কেউ তার প্রবৃত্তিকে অবৈধ আকাংখা চরিতার্থ করা থেকে বিরত রেখেছে আর কেউ প্রবৃত্তির দাসত্ব করতে গিয়ে সবকিছু করে বসেছে। কেউ জুলুম করেছে আর কেউ জুলুম বরদাশত করেছে। কেউ অধিকার দিয়েছে আর কেউ অধিকার নস্যাত করেছে। কেউ মৃত্যু পর্যন্ত পৃথিবীতে কল্যাণের কাজ করেছে আবার কেউ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কুকর্ম করেছে। কেউ ন্যায়কে সমুন্নত করার জন্য জীবনপাত করেছে। আবার কেউ বাতিলকে সমুন্নত করার জন্য ন্যায়ের অনুসারীদের ওপর জুলুম চালিয়ে গেছে।

هَلْ أَتٰىكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرٰهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٤﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلٰمًا ۖ قَالَ سَلٰمٌ ۚ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿٢٥﴾ فَرَاغَ إِلٰىٓ أَهْلِهِۦ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٢٦﴾ فَقَرَّبَهُۥٓ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلٰمٍ عَلِيمٍ ﴿٢٨﴾ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُۥ فِى صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٢٩﴾ قَالُوا كَذٰلِكِ ۙ قَالَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٣٠﴾

২ রুকূ'

হে নবী,[২১] ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের কাহিনী কি তোমার কাছে পৌঁছেছে?[২২] তারা যখন তার কাছে আসলো, বললো ঃ আপনার প্রতি সালাম। সে বললো ঃ "আপনাদেরকেও সালাম—কিছু সংখ্যক অপরিচিত লোক।[২৩] পরে সে নীরবে তার পরিবারের লোকদের কাছে গেল[২৪] এবং একটা মোটা তাজা বাছুর[২৫] এনে মেহমানদের সামনে পেশ করলো। সে বললো ঃ আপনারা খান না কেন? তারপর সে মনে মনে তাদের ভয় পেয়ে গেল।[২৬] তারা বললো ঃ ভয় পাবেন না। তাছাড়া তারা তাকে এক জ্ঞানবান পুত্র সন্তান জন্মের সুসংবাদ দিল।[২৭] একথা শুনে তার স্ত্রী চিৎকার করতে করতে অগ্রসর হলো। সে আপন গালে চপেটাঘাত করে বললো ঃ বুড়ী বন্ধ্যা।[২৮] তারা বললো ঃ তোমার রব একথাই বলেছেন। তিনি মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ।[২৯]

এমন কোন ব্যক্তি যার বিবেকের চোখ একেবারেই অন্ধ হয়ে যায়নি সে কি একথা বলতে পারে যে, এ ধরনের একটি সত্তা আকস্মিকভাবে পৃথিবীতে অস্তিত্ব লাভ করেছে? এর পেছনে কোন যুক্তি ও পরিকল্পনা কার্যকর নেই? তার হাতে পৃথিবীতে যেসব কর্মকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে তা সবই ফলাফল এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যহীনভাবে শেষ হয়ে যাবে? কোন ভাল কাজের ভাল ফল এবং কোন মন্দ কাজের মন্দ ফল নেই? কোন জুলুমের কোন প্রতিকার এবং কোন জালেমের কোন জবাবদিহি নেই? যুক্তিবুদ্ধির ধার ধারে না এমন লোকই কেবল এ ধরনের কথা বলতে পারে। কিংবা বলতে পারে এমন লোক যে আগে থেকেই শপথ করে বসে আছে যে, মানব সৃষ্টির পেছনে যত বড় বৈজ্ঞানিক লক্ষ থাকার কথা বলা হোক, তা অস্বীকার করতেই হবে। কিন্তু গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতামুক্ত একজন লোকের পক্ষে একথা না মেনে উপায় নেই যে, মানুষকে যেভাবে

যেসব ক্ষমতা ও যোগ্যতা দিয়ে পৃথিবীতে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যে মর্যাদা তাকে এখানে দেয়া হয়েছে তা নিশ্চিতভাবেই একটি অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা। যে আল্লাহ এমন পরিকল্পনা করতে পারেন, তাঁর বিচক্ষণতা অনিবার্যরূপে দাবী করে যে, মানুষকে তার কাজ–কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। আর সেই আল্লাহর শক্তি–সামর্থ সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করা মোটেই ঠিক নয় যে, তিনি যে মানুষকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখার মত একটি কোষ থেকে সৃষ্টি করে এ পর্যায়ে পৌছিয়েছেন তাকে তিনি পুনরায় অস্তিত্ব দান করতে পারবেন না।

২০. এখানে আসমান অর্থ উর্ধজগত। মানুষকে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার এবং কাজ করার জন্য যা কিছু দেয়া হয় রিযিক অর্থে তার সবকিছুই বুঝায়। আর সমস্ত আসমানী কিতাব ও এ কুরআনে কিয়ামত, হাশর ও পুনরুত্থান, হিসেব–নিকেশ ও জবাবদিহি, পুরস্কার ও শাস্তি এবং জান্নাত ও জাহান্নামের যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে مَا تُوعَدُونَ বলে সেসবকেই বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর এ বাণীর অর্থ হচ্ছে, দুনিয়ায় তোমাদের কাকে কি দিতে হবে তার ফায়সালা উর্ধজগত থেকেই হয়। তাছাড়া জবাবদিহি ও কর্মফল দেয়ার জন্য কখন তলব করা হবে সে ফায়সালাও সেখান থেকেই হবে।

২১. এখান থেকে দ্বিতীয় রুকূ'র শেষ পর্যন্ত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এবং কিছু সংখ্যক অতীত জাতির পরিণতির প্রতি একের পর এক সংক্ষিপ্তভাবে ইংগিত দেয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য মানুষের মনে দু'টি জিনিস বদ্ধমূল করে দেয়া।

একটি হচ্ছে, মানব ইতিহাসে আল্লাহর প্রতিদানের বিধান সবসময় কার্যকর আছে। এ বিধানে নেককারদের জন্য পুরস্কার এবং জালেমদের জন্য শাস্তির দৃষ্টান্ত সবসময় কার্যকর দেখা যায়। এটি এ বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ যে, এ পার্থিব জীবনেও মানুষের সাথে তার স্রষ্টার আচরণ কেবল প্রাকৃতিক বিধান (Physical Law) অনুসারে হয় না, বরং তার সাথে নৈতিক বিধানও (Moral Law) সক্রিয়। তাছাড়া এ গোটা বিশ্ব–জাহান সাম্রাজ্যের স্বভাবই যখন এই যে, যে সৃষ্টিকে বস্তুগত দেহে অবস্থান করে নৈতিক কাজ–কর্মের সুযোগ দেয়া হয়েছে তার সাথে পশু ও উদ্ভিদরাজির মত কেবল প্রাকৃতিক বিধান অনুসারে আচরণ করা হবে না, বরং তার নৈতিক কাজ–কর্মের ওপর নৈতিক প্রতিফলের বিধানও কার্যকর করা হবে তখন এ দ্বারা স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, এ সাম্রাজ্যে এমন একটা সময় অবশ্যই আসতে হবে যখন এ প্রাকৃতিক জগতে মানুষের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর নিরেট নৈতিক আইনানুসারে তার নৈতিক কাজ–কর্মের ফলাফল পূর্ণরূপে প্রকাশ পাবে। কারণ এ বস্তুজগতে তা পূর্ণরূপে প্রকাশ পেতে পারে না।

এ ঐতিহাসিক ইংগিতসমূহের মাধ্যমে দ্বিতীয় যে জিনিসটি মানুষের মনে বদ্ধমূল করানো হয়েছে তা হচ্ছে, যেসব জাতিই আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের কথা মানেনি এবং নিজেদের জীবনের গোটা আচরণ তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত অস্বীকৃতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে তুলেছে শেষ পর্যন্ত তারা ধ্বংসের উপযুক্ত হয়ে গিয়েছে। নবী–রসূলদের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে নৈতিক বিধান দেয়া হয়েছে এবং সে বিধানানুসারে আখেরাতে মানুষের কাজ–কর্মের যে জবাবদিহি করতে হবে তা যে বাস্তব ও সত্য ইতিহাসের এ নিরবচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতাই তার সাক্ষী। কারণ যে জাতিই এ বিধানের তোয়াক্কা না করে নিজেকে দায়িত্ব ও জবাবদিহি মুক্ত মনে করে এ পৃথিবীতে তার

করণীয় নির্ধারণ করেছে পরিণামে সে জাতি সরাসরি ধ্বংসের পথের দিকে অগ্রসর হয়েছে।

২২. ইতিপূর্বে কুরআন মজীদের তিনটি স্থানে এ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা হূদ, ৬৯ থেকে ৭৬ আয়াত; সূরা আল হিজর, আয়াত ৫১ থেকে ৬০; সূরা আল আনকাবূত, আয়াত ৩১ ও ৩২ টীকাসহ।

২৩. পূর্বাপর প্রসংগ অনুসারে এ আয়াতাংশের দুটি অর্থ হতে পারে। একটি হচ্ছে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নিজেই সে মেহমানদের বলেছিলেন যে, পূর্বে কখনো আপনাদের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয়নি। আপনারা হয়তো এ এলাকায় নতুন এসেছেন। অপরটি হচ্ছে, তাদের সালামের জবাব দেয়ার পর হযরত ইবরাহীম মনে মনে বললেন কিংবা বাড়ীতে মেহমানদারির ব্যবস্থা করার জন্য যাওয়ার সময় তাদের খাদেমদের বললেন, এরা অপরিচিত লোক। আগে কখনো এ এলাকায় এরূপ জাঁকজমক ও বেশভূষার লোক দেখা যায়নি।

২৪. অর্থাৎ নিজের মেহমানদের একথা বলেননি যে, আপনাদের জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা করছি। বরং তাদেরকে বসিয়ে রেখে নীরবে মেহমানদারির ব্যবস্থা করতে চলে গিয়েছেন যাতে মেহমান সৌজন্যের খাতিরে একথা না বলে যে, এ কষ্ট স্বীকারের প্রয়োজন কি?

২৫. সূরা হূদে عِجْلٍ حَنِيْذٍ (ভূনা বাছুর) কথাটি আছে। এখানে বলা হয়েছে যে, তিনি ভালভাবে বাছাই করে মোটা তাজা গো-বৎস ভূনা করিয়েছিলেন।

২৬. অর্থাৎ তাদের হাত যখন খাবারের দিকে এগুলো না, তখন হযরত ইবরাহীমের মনে ভয়ের সঞ্চার হলো। গোত্রীয় জীবনধারায় কারো বাড়ীতে অপরিচিত মুসাফিরের খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকা কোন অসদুদ্দেশ্যে আগমনের লক্ষণ বলে মনে করা হয়। এটাও তাঁর ভয়ের একটা কারণ হতে পারে। তবে খুব সম্ভব, খাবার গ্রহণ থেকে তাদের বিরত থাকাতেই হযরত ইবরাহীম বুঝে ফেলেছিলেন যে, তারা ফেরেশতা, মানুষের রূপ ধরে এখানে এসেছে। তাছাড়া মানুষের আকৃতিতে ফেরেশতাদের আগমন যেহেতু অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই হয়ে থাকে তাই তিনি আশংকা করেছিলেন, কোন ভয়ংকর পরিস্থিতি আসন্ন, যার কারণে এসব ফেরেশতা এভাবে আগমন করেছে।

২৭. সূরা হূদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, এটা ছিল হযরত ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্মের সুসংবাদ। এর মধ্যে এ সুসংবাদও আছে যে, হযরত ইসহাকের ঔরসে তিনি হযরত ইয়া'কুব আলাইহিস সালামের মত নাতিও লাভ করবেন।

২৮. অর্থাৎ একদিকে আমি বুড়ী অপর দিকে বন্ধ্যা। এমন অবস্থায় আমার সন্তান হবে? বাইবেলে বলা হয়েছে, সে সময় হযরত ইবরাহীমের বয়স ছিল এক শ' বছর এবং হযরত সারার বয়স ছিল ৯০ বছর। (আদি পুস্তক, ১৮ : ১৭)

২৯. এ কাহিনী বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর যে বান্দা দুনিয়ায় আল্লাহর বন্দেগীর হক যথাযথভাবে আদায় করেছিল আখেরাতে তার সাথে যে আচরণ হবার তাতো হবেই। এ দুনিয়াতেও তাকে এভাবে পুরস্কৃত করা হয়েছে যে, সাধারণ প্রাকৃতিক বিধান অনুসারে যে বয়সে সন্তান হওয়ার কথা ছিল না এবং তার স্ত্রীও সারা জীবন নিঃসন্তান থেকে চূড়ান্তভাবে নিরাশ হয়ে পড়েছিলো, সেই বয়সে আল্লাহ তাকে সন্তান দান করেছেন শুধু

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٣١﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ
قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ ﴿٣٣﴾ مُسَوَّمَةً
عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٤﴾ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾
فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً
لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٣٧﴾

ইবরাহীম বললো ঃ হে আল্লাহর প্রেরিত দূতগণ, আপনাদের অভিপ্রায় কি?[৩০] তারা বললো ঃ আমাদেরকে একটি পাপী জাতির কাছে পাঠানো হয়েছে[৩১] যাতে আমরা তাদের ওপর পোড়ানো মাটির পাথর বর্ষণ করি—যা আপনার রবের কাছে সীমালংঘনকারীদের জন্য চিহ্নিত আছে।[৩২] অতপর[৩৩] ঐ জনপদে যারা মু'মিন ছিলো তাদের সবাইকে বের করে নিলাম। আমি সেখানে একটি পরিবার ছাড়া আর কোন মুসলিম পরিবার পাইনি।[৩৪] অতপর যারা কঠোর আযাবকে ভয় করে তাদের জন্য সেখানে একটি নিদর্শন রেখে দিয়েছি।[৩৫]

তাই নয় এমন নজীরবিহীন সন্তান দান করেছেন যা আজ পর্যন্ত কারো ভাগ্যে জোটেনি। এ পৃথিবীতে দ্বিতীয় এমন কোন মানুষ নেই যার বংশে পর পর চারজন নবী জন্মলাভ করেছেন। হযরত ইবরাহীমই (আ) ছিলেন এমন ব্যক্তিত্ব যার বংশে অধস্তন তিন পুরুষ পর্যন্ত নবুওয়াতের ধারা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছিলো এবং তার পরিবারেই হযরত ইসমাঈল, হযরত ইসহাক, হযরত ইয়া'কুব এবং হযরত ইউসুফ আলাইহিমুস সালামের মত মহা সম্মানিত নবীদের জন্ম হয়েছিলো।

৩০. মানুষের আকৃতিতে ফেরেশতাদের আগমন যেহেতু কোন বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য হয়ে থাকে তাই তাদের আগমনের উদ্দেশ্য অবহিত হওয়ার জন্য হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম خطب শব্দ ব্যবহার করেছেন। আরবী ভাষায় خطب শব্দটি কোন মামুলি কাজের জন্য ব্যবহৃত হয় না, বরং কোন বড় গরুত্বপূর্ণ কাজ বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।

৩১. অর্থাৎ লূতের (আ) জাতি। তাদের অপরাধ এতটা বৃদ্ধি পেয়েছিলো যে, 'অপরাধী জাতি' শুধু এ শব্দটাই জাতি হিসেবে তাদের পরিচয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল। এর আগে কুরআন, মজীদের নিম্ন বর্ণিত স্থানসমূহে এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। তাফহীমুল কুরআন, সূরা সা'দ, আয়াত ৮০ থেকে ৮৪; হূদ, ৭৩ থেকে ৮৩; সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত ৭৪, ৭৫; সূরা আশ শু'আরা, ১৬০ থেকে ১৭৫; আন নাম্‌ল, ৫৪ থেকে ৫৮ ও ৬৩ থেকে ৬৮; সূরা সাফ্‌ফাত, ১৩৩ থেকে ১৩৮ টীকাসহ।

৩২. অর্থাৎ কোন্ পাথরটি কোন্ অপরাধীর মস্তক চূর্ণ করবে আপনার রবের পক্ষ থেকে তা ঐ পাথরের গায়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। সূরা হূদ ও আল হিজরে এ আযাবের যে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে, তাদের জনপদসমূহ ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে এবং ওপর থেকে পোড়ানো মাটির পাথর বর্ষণ করা হয়েছে। এ থেকে ধারণা করা যায় যে, প্রচণ্ড ভূমিকম্পে গোটা অঞ্চল উলটপালট করে দেয়া হয়েছে এবং যারা ভূমিকম্প থেকে রক্ষা পেয়ে পালিয়েছিল আগ্নেয়গিরির লাভার সাথে নির্গত পাথর–বৃষ্টি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

৩৩. এ ফেরেশতারা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের নিকট থেকে কিভাবে হযরত লূতের (আ) কাছে পৌছলো এবং সেখানে তাদের ও লূতের (আ) জাতির মাঝে কি ঘটলো সেসব কাহিনীর বর্ণনা এখানে বাদ দেয়া হয়েছে। সূরা হূদ, আল হিজ্র ও আল আনকাবূতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আগেই করা হয়েছে। যে সময় এ জাতির ওপর আযাব নাযিল হতে যাচ্ছে এখানে শুধু সেই চরম মুহূর্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৩৪. অর্থাৎ গোটা জাতি ও এলাকায় একটি মাত্র পরিবার ছিল যেখানে ইসলামের আলো বিদ্যমান ছিল। আর সেটা ছিল হযরত লূত আলাইহিস সালামের পরিবার। এ ছাড়া গোটা জাতি অশ্লীলতা ও পাপাচারে ডুবে ছিল এবং তাদের গোটা দেশ পঙ্কিলতায় ভরে উঠেছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা সেই একটি পরিবারের লোকজনকে রক্ষা করে বের করে নিলেন এবং তারপর সেই দেশে এমন প্রলয়ঙ্করী আযাব নাযিল করলেন যে, এ দুশ্চরিত্র জাতির একটি লোকও রক্ষা পায়নি। এ আয়াতটিতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণিত হয়েছে ঃ

এক ঃ আল্লাহর প্রতিফল বিধান কোন জাতিকে ততদিন পরিপূর্ণরূপে ধ্বংস করার ফায়সালা করে না যতদিন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন ভালো গুণ বিদ্যমান থাকে। খারাপ লোকদের সংখ্যাধিক্যের মধ্যে নগণ্য সংখ্যক কিছু লোকও যদি অকল্যাণকে প্রতিরোধ করার এবং কল্যাণের পথের দিকে ডাকার জন্য তৎপর থাকে এবং তাদের কল্যাণকারিতা এখনো নিঃশেষ হয়ে না থাকে তাহলে আল্লাহ তাদেরকে আরো কিছুকাল কাজ করার সুযোগ দেন এবং তাদের অবকাশকাল বাড়িয়ে দিতে থাকেন। কিন্তু অবস্থা যদি এই দাঁড়ায় যে, কোন জাতির মধ্যে যৎসামান্য সদগুণও অবশিষ্ট না থাকে সে ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান হচ্ছে, উক্ত জনপদে যে দু' চারজন লোক অকল্যাণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে ক্লান্ত হয়ে নেতিয়ে পড়েছে, তিনি তাঁর মহা ক্ষমতাধীনে কোন না কোনভাবে তাদেরকে রক্ষা করে নিরাপদে বের করেন এবং অবশিষ্ট লোকদের সাথে ঠিক তেমনি আচরণ করেন, যে আচরণ একজন সুস্থ বিবেক–বুদ্ধি সম্পন্ন লোক পঁচা ফলের সাথে করে থাকে।

দুই ঃ 'মুসলমান' কেবল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের নাম নয়। তাঁর পূর্বের সমস্ত নবী–রসূল ও তাঁদের উম্মতও মুসলমান ছিলেন। তাঁদের দীনও ভিন্ন ভিন্ন ছিল না যে, কোনটা ইবরাহীমের দীন, কোনটা মূসার দীন আবার কোনটা 'ঈসার দীন বলে আখ্যায়িত হতে পারে। তাঁরা সবাই ছিলেন মুসলমান এবং তাদের দীনও ছিল এ ইসলাম। কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় এ সত্যটি এমন সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নবর্ণিত

وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٣٩﴾ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٤٠﴾ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٤١﴾ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴿٤٢﴾ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٣﴾ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿٤٤﴾ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ ﴿٤٥﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٤٦﴾

এ ছাড়া (তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে) মূসার কাহিনীতে। আমি যখন তাকে স্পষ্ট প্রমাণসহ ফেরাউনের কাছে পাঠালাম[৩৬] তখন সে নিজের শক্তিমত্তার ওপর গর্ব প্রকাশ করলো এবং বললো ঃ এ তো যাদুকর কিংবা পাগল।[৩৭] অবশেষে আমি তাকে ও তার সৈন্যদেরকে পাকড়াও করলাম এবং সবাইকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। আর সে তিরস্কৃত ও নিন্দিত হলো।[৩৮]

তাছাড়া (তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে) আদ জাতির মধ্যে। যখন আমি তাদের ওপর এমন অশুভ বাতাস পাঠালাম যে, তা যে জিনিসের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হলো তাকেই জরাজীর্ণ করে ফেললো।[৩৯]

তাছাড়া (তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে) সামূদ জাতির মধ্যে। যখন তাদের বলা হয়েছিলো যে, একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মজা লুটে নাও।[৪০] কিন্তু এ সতর্কীকরণ সত্ত্বেও তারা তাদের রবের হুকুম অমান্য করলো। অবশেষে তারা দেখতে দেখতে অকস্মাত আগমনকারী আযাব[৪১] তাদের ওপর আপতিত হলো। এরপর উঠে দাঁড়ানোর শক্তিও তাদের থাকলো না এবং তারা নিজেদের রক্ষা করতেও সক্ষম ছিল না।[৪২]

আর এদের সবার পূর্বে আমি নূহের কওমকে ধ্বংস করেছিলাম। কারণ তারা ছিল ফাসেক।

আয়াতগুলো দেখুন ঃ আল বাকারা, ১২৮, ১৩১, ১৩২, ও ১৩৩; আলে ইমরান, ৬৭; আল মায়েদা, ৪৪ ও ১১১; ইউনুস, ৭২ ও ৮৪; ইউসুফ, ১০১; আল আ'রাফ, ১২৬ ও আন্ নাহ্ল, ৩১, ৪২ ও ৪৪।

তিন ঃ 'মু'মিন' ও 'মুসলিম' শব্দ দু'টি এ আয়াতে সম্পূর্ণ সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ আয়াতটি যদি সূরা হুজুরাতের ১৪ আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়া যায় তাহলে সেসব লোকদের ধারণার ভ্রান্তি পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যারা 'মু'মিন' ও 'মুসলিম' শব্দকে কুরআন মজীদের এমন দু'টি স্বতন্ত্র পরিভাষা বলে মনে করে যা সবখানে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এও মনে করে যে, ঈমান ছাড়াই যে ব্যক্তি বাহ্যত ইসলামের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করেছে সে-ই নিশ্চিত মুসলিম। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা হুজুরাতের ব্যাখ্যা, টীকা ৩১)।

৩৫. এ নিদর্শন অর্থ মরু সাগর (Dead Sea) বর্তমানেও যার দক্ষিণাঞ্চল এক সাংঘাতিক ধ্বংসের নিদর্শন পেশ করছে। প্রত্নতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা এই যে, লূতের (আ) জাতির বৃহৎ শহর খুব সম্ভবত প্রচণ্ড ভূমিকম্পে ধসে ভূগর্ভে তলিয়ে গিয়েছিলো এবং তার উপরিভাগে মরু সাগরের পানি ছেয়ে গিয়েছিলো। কারণ, এই সাগরের যে অংশ اللسان (আল লিসান) নামক ক্ষুদ্র উপদ্বীপের দক্ষিণে অবস্থিত তা পরবর্তী সময়ে সৃষ্ট বলে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় এবং এ উপদ্বীপের উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত প্রাচীন মরু সাগরের যেসব নিদর্শন দেখা যায় তা দক্ষিণের নিদর্শন থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। এ থেকে অনুমান করা হয় যে, উপদ্বীপের দক্ষিণের অংশ আগে মরু সাগর পৃষ্ঠ থেকে উঁচু ছিল। পরবর্তীকালে কোন এক সময় ধসে নীচে দেবে গিয়েছে। এর ধসে যাওয়ার সময়টাও খৃষ্টপূর্ব দু' হাজার সনের সম-সাময়িক বলে মনে হয়। ঐতিহাসিকভাবে এটাই হযরত ইবরাহীম ও হযরত লূতের (আ) যুগ। ১৯৬৫ সালে একদল আমেরিকান প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানী আল লিসানে এক বিশাল কবরস্থান আবিষ্কার করেছে যেখানে ২০ হাজারের অধিক কবর আছে। এ থেকে অনুমিত হয় যে, নিকটেই কোন বড় শহর অবশ্যই থাকবে। কিন্তু আশেপাশে কোথাও এমন কোন শহরের নিদর্শন নেই যার পাশেই এত বড় কবরস্থান গড়ে উঠতে পারে। এ থেকেও এ সন্দেহ দৃঢ়মূল হয় যে, এটি যে শহরের কবরস্থান ছিল তা সাগরে নিমজ্জিত হয়েছে। সাগরের দক্ষিণে যে এলাকা অবস্থিত সেখানে এখনো যত্রতত্র ধ্বংসের নিদর্শন বিদ্যমান এবং ভূমিতে গন্ধক, আলকাতরা, কয়লাজাত পিচ ও প্রাকৃতিক গ্যাসের এমন বিপুল মজুদ বর্তমান যা দেখে ধারণা জন্মে যে, এখানে কোন এক সময় বজ্রপাত হওয়ায় কিংবা ভূমিকম্পের কারণে লাভা উদ্‌গীরণ হওয়ায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হয়ে থাকবে (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আশ্ শু'আরা, টীকা ১১৪)।

৩৬. অর্থাৎ এরূপ সুস্পষ্ট মু'জিযা এবং প্রকাশ্য নিদর্শনসহ পাঠিয়েছিলেন যে, তিনি যে আসমান ও যমীনের স্রষ্টার পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়ে এসেছিলেন সে বিষয়টি আর সন্দেহযুক্ত ছিল না।

৩৭. অর্থাৎ কোন সময় সে তাঁকে যাদুকর বলে আখ্যায়িত করেছিলো আবার কখনো বলেছিলো এ ব্যক্তি পাগল।

৩৮. এ ক্ষুদ্র বাক্যাংশটিতে ইতিহাসের একটি পূর্ণাংগ ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। ঘটনাটা বুঝার জন্য কল্পণার চোখের সামনে এ চিত্রটি একটু নিয়ে আসুন যে, ফেরাউন তৎকালীন পৃথিবীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় কেন্দ্রের শক্তিধর শাসক ছিল, যার জাঁকজমক ও প্রভাব প্রতিপত্তিতে আশেপাশের সমস্ত জাতি ভীত সন্ত্রস্ত ছিল। একথা সুবিদিত যে, হঠাৎ একদিন যখন সে তার সৈন্য সামন্তসহ পানিতে ডুবে মরলো, তখন শুধু

মিশরেই নয়, আশেপাশের সমস্ত জাতির মধ্যে এ ঘটনা ব্যাপক প্রচার লাভ করে থাকবে। কিন্তু এতে ডুবে মরা লোকদের নিকটাত্মীয় ছাড়া আর কেউই এমন ছিলো না যারা তাদের নিজের দেশে কিংবা পৃথিবীর অন্য কোন জাতির মধ্যে তাদের জন্য শোক প্রকাশ করতো, কিংবা অন্তত এতোটুকুই বলতো যে, হায়! এ দুর্ঘটনার শিকার লোকেরা কত ভাল মানুষ ছিল। পক্ষান্তরে পৃথিবী যেহেতু তাদের জুলুম-অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো তাই তাদের এ দৃষ্টান্তমূলক পরিণতিলাভের কারণে প্রতিটি মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলো। প্রতিটি মুখই তাদের ওপর তিরস্কার ও নিন্দাবাদ বর্ষণ করেছে এবং যে-ই খবরটি শুনেছে সে-ই বলে উঠেছে, এ দুরাচার তার উপযুক্ত পরিণতিই ভোগ করেছে। সূরা দুখানে এ অবস্থাটা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ "অতপর না আসমান তাদের জন্য কেঁদেছে না যমীন তাদের জন্য অশ্রু বর্ষণ করেছে।" (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা দুখান, টীকা ২৫)।

৩৯. এ বাতাসের জন্য عَقِيم শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা বন্ধ্যা নারীদের বুঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অভিধানে এর প্রকৃত অর্থ يابس বা শুষ্ক। যদি শব্দটিকে আভিধানিক অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে এর অর্থ হবে, তা ছিল এমন প্রচণ্ড গরম ও শুষ্ক বাতাস যে, তা যে জিনিসের ওপর দিয়েই প্রবাহিত হয়েছে তাকে শুষ্ক করে ফেলেছে। আর যদি শব্দটিকে পারিভাষিক অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে তার অর্থ হবে তা ছিল বন্ধ্যা নারীর মত এমন হাওয়া যার মধ্যে কোন কল্যাণ ছিল না। তা না ছিল আরামদায়ক, না ছিল বৃষ্টির বাহক। না ছিল বৃক্ষরাজিকে ফলবানকারী না এমন কোন কল্যাণ তার মধ্যে ছিল যে জন্য বাতাস প্রবাহিত হওয়া কামনা করা হয়। অন্য স্থানসমূহে বলা হয়েছে এ বাতাস শুধু কল্যাণহীন ও শুষ্কই ছিল না বরং তা প্রচণ্ড ঝড়ের আকারে এসেছিলো যা মানুষকে শূন্যে তুলে তুলে সজোরে আছড়িয়ে ফেলেছে এবং এ অবস্থা একাদিক্রমে আটদিন ও সাত রাত পর্যন্ত চলেছে। এভাবে আদ জাতির গোটা এলাকা তছনছ করে ফেলেছে (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা হা-মীম আস সাজদার তাফসীর, টীকা ২০-২১ ও আল আহক্বাফ, টীকা ২৫ থেকে ২৮)।

৪০. এখানে কোন্ অবকাশ বুঝানো হয়েছে সে ব্যাপারে মুফাস্সিরদের মধ্যে মতভেদ আছে। হযরত কাতাদা বলেন, এর দ্বারা সূরা হূদের সে আয়াতটির বিষয়বস্তুর প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যাতে বলা হয়েছে সামূদ জাতির লোকেরা হযরত সালেহর (আ) উটনীকে হত্যা করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয় যে, তোমরা তিন দিন পর্যন্ত ফূর্তি করে নাও। এরপরই তোমাদের ওপর আযাব আসবে। অপর দিকে হযরত হাসান বাসরী মনে করেন, একথা হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম দাওয়াতের প্রথম দিকেই তাঁর কওমকে বলেছিলেন। এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, যদি তোমরা তাওবা ও ঈমানের পথ অবলম্বন করো তাহলে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সুযোগ লাভ করবে এবং এরপরেই কেবল তোমাদের দুর্দিন আসবে। এ দু'টি ব্যাখ্যার মধ্যে দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিই অধিক বিশুদ্ধ বলে মনে হয়। কারণ, পরবর্তী আয়াত فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ (এরপর তারা তাদের রবের নির্দেশ লংঘন করলো) থেকে বুঝা যায় যে, এখানে যে অবকাশের কথা বলা হচ্ছে তা সীমালংঘনের পূর্বে দেয়া হয়েছিলো। আর তারা সীমালংঘন করেছিল এ সতর্ক বাণীর পরে। অন্যদিকে সূরা হূদের আয়াতে তিনদিনের যে অবকাশের

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْىٍدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٩﴾ فَفِرُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ ؕ اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥٠﴾ وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ؕ اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥١﴾ كَذٰلِكَ مَآ اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ﴿٥٢﴾

৩ রুকূ'

আসমানকে[৪৩] আমি নিজের ক্ষমতায় বানিয়েছি এবং সে শক্তি আমার আছে।[৪৪] যমীনকে আমি বিছিয়ে দিয়েছি। আমি উত্তম সমতলকারী।[৪৫] আমি প্রত্যেক জিনিসের জোড়া বানিয়েছি।[৪৬] হয়তো তোমরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।[৪৭] অতএব আল্লাহর দিকে ধাবিত হও। আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমার জন্য স্পষ্ট সাবধানকারী। আল্লাহর সাথে আর কাউকে উপাস্য বানাবে না। আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য স্পষ্ট সাবধানকারী।[৪৮]

এভাবেই হয়ে এসেছে। এদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের কাছেও এমন কোন রসূল আসেনি যাকে তারা যাদুকর বা পাগল বলেনি।[৪৯]

উল্লেখ করা হয়েছে তা ঐ সব অপরাধীর পক্ষ থেকে চূড়ান্ত ও সিদ্ধান্তকর সীমালংঘন হয়ে যাওয়ার পরে দেয়া হয়েছিলো।

৪১. এ আযাবের কথা বুঝাতে কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কোথাও একে رجفة (ভীতি প্রদর্শনকারী ও প্রকম্পিতকারী বিপদ) বলা হয়েছে। কোথাও একে صيحة (বিস্ফোরণ ও বজ্রধ্বনি) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কোথাও একে বুঝাতে طاغية (কঠিনতম বিপদ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর এখানে একেই صاعقة বলা হয়েছে যার অর্থ বিদ্যুতের মত অকস্মাত আগমনকারী বিপদ এবং কঠোর বজ্রধ্বনি উভয়ই। সম্ভবত এ আযাব এমন এক ভূমিকম্পের আকারে এসেছিলো যার সাথে আতংক সৃষ্টিকারী শব্দও ছিল।

৪২. মূল আয়াতাংশ হচ্ছে مَا كَانُوْا مُنْتَصِرِيْنَ । আরবী ভাষায় انتصار শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর একটি অর্থ হচ্ছে নিজেকে কারো আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। অপর অর্থটি হচ্ছে হামলাকারী থেকে প্রতিশোধ নেয়া।

৪৩. আখেরাতের সপক্ষে ঐতিহাসিক প্রমাণাদি পেশ করার পর এখন তার সমর্থনে বাস্তব জগতের বিদ্যমান প্রমাণাদি পেশ করা হচ্ছে।

৪৪. মূল আয়াতাংশ وَاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ । مُوسِع অর্থ ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী এবং প্রশস্তকারী উভয়টিই হতে পারে। প্রথম অর্থ অনুসারে এ বাণীর অর্থ হয় আমি কারো সাহায্যে এ আসমান সৃষ্টি করিনি, বরং নিজের ক্ষমতায় সৃষ্টি করেছি আর তা করা আমার সাধ্যের বাইরে ছিল না। তা সত্ত্বেও তোমাদের মন-মগজে এ ধারণা কি করে আসলো যে, আমি পুনরায় তোমাদের সৃষ্টি করতে পারবো না? দ্বিতীয় অর্থ অনুসারে একথার অর্থ দাঁড়ায় এ বিশাল বিশ্ব-জাহানকে একবার সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হইনি, বরং ক্রমাগত তার সম্প্রসারণ ঘটাচ্ছি এবং তার মধ্যে প্রতি মুহূর্তে সৃষ্টির নতুন নতুন বিস্ময়কর দিক প্রকাশ পাচ্ছে। এরূপ মহা পরাক্রমশালী সৃষ্টিকারী সত্তার পুনরায় সৃষ্টি করার ক্ষমতাকে তোমরা অসম্ভব মনে করে নিয়েছো কেন?

৪৫. ১৮নং টীকায় এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আন নামূল, টীকা ৭৪; সূরা ইয়াসীনের ব্যাখ্যা, টীকা ২৯ এবং আয যুখরুফ, টীকা ৭ থেকে ১০।

৪৬. অর্থাৎ জোড়ায় জোড়ায় সৃজনের নীতির ভিত্তিতে পৃথিবীর সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করা হয়েছে। একটি জিনিসের সাথে আরেকটি জিনিসের সম্মিলন বা সংযোগ ঘটে এবং তাদের সংযুক্ত হওয়ার সাথে সাথে নানা রকমের যৌগিক বস্তু অস্তিত্ব লাভ করে। এখানে কোন বস্তুই এমন স্বতন্ত্র ও একক নয় যে, অন্য কোন জিনিসের সাথে তার জোড়া হয় না। প্রতিটি বস্তুই তার জোড়ার সাথে মিলে ফলপ্রসূ হয়। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, ইয়াসীন, টীকা ৩১; আয যুখরুফ, টীকা ১২)

৪৭. অর্থাৎ গোটা বিশ্ব-জাহানকে জোড়া বেঁধে সৃষ্টি করার নীতির ভিত্তিতে সৃষ্টি করা এবং পৃথিবীর সব জিনিস জোড়ায় জোড়ায় হওয়া এমন একটি সত্য যা আখেরাতের অনিবার্যতার সুস্পষ্ট সাক্ষ দিচ্ছে। তোমরা যদি গভীরভাবে চিন্তা করো তাহলে তোমাদের বিবেক-বুদ্ধি এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে যে, দুনিয়ার প্রতিটি জিনিসের যখন জোড়া আছে এবং কোন কিছু তার জোড়ার সাথে না মিশে ফলপ্রসূ হতে পারে না তখন দুনিয়ার এ জীবন জোড়াহীন কি করে হতে পারে? আর আখেরাতই এর অনিবার্য জোড়া। আখেরাত না থাকলে এ দুনিয়া একেবারেই নিষ্ফল হবে।

পরবর্তী বিষয় বুঝার জন্য এখানে একথাটিও ভাল করে বুঝে নিতে হবে যে, এ পর্যন্তকার গোটা আলোচনা যদিও আখেরাত সম্পর্কিত বিষয়েই হয়ে আসছে তা সত্ত্বেও এসব আলোচনা ও যুক্তিতর্ক থেকে তাওহীদের প্রমাণও পাওয়া যায়। বৃষ্টির ব্যবস্থাপনা, পৃথিবীর গঠনাকৃতি, আসমানের সৃষ্টি, মানুষের নিজের অস্তিত্ব, গোটা বিশ্ব-জাহানে জোড়া বেঁধে সৃষ্টি নীতির বিস্ময়কর কর্মকাণ্ড ও ফলাফল, এসব জিনিস যেমন আখেরাতের সম্ভাব্যতা ও অনিবার্যতার সাক্ষী তেমনি তা এ সাক্ষও পেশ করছে যে, এ বিশ্ব-জাহান আল্লাহহীনও নয় কিংবা বহু খোদার রাজত্বও নয় বরং এক মহাজ্ঞানী ও মহাশক্তিমান আল্লাহই এর সৃষ্টিকর্তা, মালিক এবং ব্যবস্থাপক ও শাসক। তাই পরে এসব যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতেই তাওহীদের দাওয়াত পেশ করা হচ্ছে। তাছাড়া আখেরাত বিশ্বাস করার অনিবার্য ফল হচ্ছে মানুষ আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক আচরণ পরিত্যাগ করে আনুগত্য ও দাসত্বের পথ অবলম্বন করে। মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহবিমুখ থাকে যতক্ষণ সে মনে করে যে, তাকে কারো সামনে জবাবদিহি করতে হবে না। এবং তার পার্থিব

জীবনের কাজ–কর্মের হিসেবও কারো কাছে দিতে হবে না। যখনই এ ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হবে সে মুহূর্তেই ব্যক্তির বিবেকের মধ্যে এ অনুভূতি জাগ্রত হয় যে, সে নিজেকে দায়িত্বমুক্ত মনে করে বড় ভুল করছিলো। এ অনুভূতিই তাকে আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে বাধ্য করে। এ কারণেই আখেরাতের সপক্ষে যুক্তি প্রমাণ পেশ করার পর পরই বলা হয়েছে, "অতপর আল্লাহর দিকে দ্রুত অগ্রসর হও।"

৪৮. এ বাক্যাংশ যদিও আল্লাহ তা'আলারই বাণী, কিন্তু এর বক্তা আল্লাহ তা'আলা নন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। ব্যাপারটা যেন এই যে, আল্লাহ তাঁর নবীর মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন যে, আল্লাহর দিকে দ্রুত অগ্রসর হও। আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি। এ ধরনের কথার উদাহরণ কুরআন মজীদের সর্বপ্রথম সূরা অর্থাৎ সূরা ফাতিহায় বিদ্যমান যেখানে বক্তব্য আল্লাহর কিন্তু বক্তা হিসেবে বান্দা কথাগুলো পেশ করে। اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ – اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ সেখানে যেমন একথা বলা হয়নি যে, হে ঈমানদারগণ, তোমরা তোমাদের রবের কাছে এভাবে দোয়া করো। কিন্তু কথার ধরন থেকে আপনা আপনি একথার ইংগিত পাওয়া যায় যে, এটা একটা দোয়া যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের শিখিয়ে দিচ্ছেন। ঠিক তেমনি এখানেও বলা হয়নি যে, "হে নবী, তুমি এসব লোককে বলো।" কিন্তু কথার ধরন থেকে ইংগিত পাওয়া যাচ্ছে যে এতে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশনা অনুসারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওহীদ গ্রহণের জন্য একটা আহবান পেশ করছেন। সূরা ফাতিহা ছাড়াও কুরআন মজীদের আরো কতিপয় স্থানে এ ধরনের বাণী বিদ্যমান যেখানে বক্তব্য আল্লাহর কিন্তু বক্তা কোথাও ফেরেশতা এবং কোথাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। ঐ সব ক্ষেত্রে বক্তা কে তা সুস্পষ্টভাবে পেশ করা না হলেও কথার ধরন থেকেই স্বতই প্রকাশ পায় যে, কার মুখ দিয়ে আল্লাহ তার বক্তব্য পেশ করছেন। উদাহরণ হিসেবে দেখুন, সূরা মারয়াম, ৬৪, ৬৫; আস সাফ্‌ফাত, ১৫৯ থেকে ১৬৭ ও সূরা আশ শূরা, ১০।

৪৯. অর্থাৎ এ ঘটনা এই প্রথম সংঘটিত হয়নি যে, আল্লাহর প্রেরিত রসূলের মুখে আখেরাতের খবর এবং তাওহীদের দাওয়াত শুনে মানুষ তাঁকে যাদুকর ও পাগল বলছে। রিসালাতের গোটা ইতিহাস সাক্ষী, মানব জাতির হিদায়াতের জন্য যখন থেকে রসূলের আগমন ধারা শুরু হয়েছে জাহেলরা তখন থেকে আজ পর্যন্ত একইভাবে এ নির্বুদ্ধিতার কাজটি বারবার করে যাচ্ছে। যে রসূলই এসে এ মর্মে সাবধান করেছেন যে, তোমরা বহু সংখ্যক খোদার বান্দা নও, বরং একমাত্র আল্লাহই তোমাদের স্রষ্টা, উপাস্য এবং তোমাদের ভাগ্যের মালিক ও নিয়ন্তা, জাহেলরা তখনই এ মর্মে হৈ চৈ শুরু করে দিয়েছে যে, এ ব্যক্তি যাদুকর। সে তার যাদুর সাহায্যে আমাদের বিবেক–বুদ্ধি বিকৃত করতে চায়। যে রসূলই এসে সাবধান করেছেন যে, তোমাদেরকে পৃথিবীতে দায়িত্ব মুক্ত করে ছেড়ে দেয়া হয়নি বরং জীবনের কাজ–কর্ম শেষ করার পর তোমাদেরকে তোমাদের সৃষ্টিকর্তা ও মালিকের সামনে হাজির হয়ে হিসেব দিতে হবে এবং সে হিসেবের পরিণামে নিজের কাজ–কর্মের প্রতিদান বা শাস্তি পেতে হবে, তাতে নির্বোধ লোকেরা বলে উঠেছে—এ লোকটি পাগল, এর বিবেক বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। আরে মৃত্যুর পরে কি আমরা পুনরায় জীবিত হবো?

أَتَوَاصَوْا بِهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ۝٥٣ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ ۝٥٤ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ۝٥٥

এরা কি এ ব্যাপারে পরস্পর কোন সমঝোতা করে নিয়েছে? না, এরা সবাই বরং বিদ্রোহী।৫০ অতএব, হে নবী, তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। এ জন্য তোমার প্রতি কোন তিরস্কার বাণী নেই।৫১ তবে উপদেশ দিতে থাকো। কেননা উপদেশ ঈমান গ্রহণকারীদের জন্য উপকারী।৫২

৫০. অর্থাৎ একথা সুস্পষ্ট যে, হাজার হাজার বছর ধরে প্রতিটি যুগে বিভিন্ন দেশ ও জাতির লোকদের নবী–রসূলদের দাওয়াতের মোকাবিলায় একই আচরণ করা এবং তাঁদের বিরুদ্ধে একই রকমের কথা বলার কারণ এ নয় যে, একটি সম্মেলন করে আগের ও পরের সমস্ত মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যখনই কোন নবী এসে এ দাওয়াত পেশ করবে তখনই তাঁকে এ জবাব দিতে হবে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, তাহলে তাদের আচরণের এ সাদৃশ্য এবং একই প্রকৃতির জবাবের ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি কেন? এর একমাত্র জবাব এই যে, অবাধ্যতা ও সীমালংঘন এদের সবার সাধারণ বৈশিষ্ট। তাছাড়া এ আচরণের আর কোন কারণ নেই। প্রত্যেক যুগের অজ্ঞ লোকেরাই যেহেতু আল্লাহর দাসত্ব থেকে মুক্ত ও তাঁর জিজ্ঞাসাবাদ সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে পৃথিবীতে লাগামহীন পশুর মত জীবন যাপন করতে আগ্রহী, তাই শুধু এ কারণে যিনিই তাদেরকে আল্লাহর দাসত্ব ও আল্লাহভীতিমূলক জীবন যাপনের আহবান জানিয়েছেন তাঁকেই তারা একই ধরাবাঁধা জবাব দিয়ে এসেছে।

এ আয়াত থেকে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের ওপর আলোকপাত হয়। সেটি হচ্ছে, হিদায়াত ও গোমরাহী, নেক কাজ ও বদ কাজ, জুলুম ও ন্যায় বিচার এবং এ ধরনের আরো অনেক কাজ–কর্মের যেসব প্রবণতা ও উদ্দীপনা স্বভাবসুলভভাবেই মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকে, উপায়–উপকরণের উন্নতির কারণে বাহ্যত তার রূপ–প্রকৃতি যত ভিন্নই প্রতীয়মান হোক না কেন প্রত্যেক যুগে ও পৃথিবীর প্রতিটি কোণে একইভাবে তার বহিপ্রকাশ ঘটে। আজকের মানুষ ট্যাংক, বিমান ও হাইড্রোজেন বোমার সাহায্যে যুদ্ধ করলেও এবং প্রাচীন যুগের মানুষ লাঠি ও পাথরের সাহায্যে লড়াই করলেও যে মৌলিক কারণে মানুষে মানুষে লড়াই বাধে, তাতে চুল পরিমাণ পার্থক্যও আসেনি। আজ থেকে ৬ হাজার বছর পূর্বে কোন নাস্তিকের নাস্তিকতা গ্রহণের পেছনে যে চালিকা শক্তি কাজ করেছে বর্তমান যুগের কোন নাস্তিক তার নাস্তিকতার সপক্ষে যত যুক্তিই পেশ করুক না কেন, তাকে এ পথে পরিচালিত করার পেছনেও হুবহু সেসব চালিকা শক্তিই কাজ করে। যুক্তি–প্রমাণ পেশের ক্ষেত্রেও সে তার পূর্বসূরীদের চেয়ে মৌলিকভাবে ভিন্ন কিছু বলে না।

৫১. এ আয়াতে দীনের তাবলীগের একটি নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে। বিষয়টি ভালভাবে বুঝে নিতে হবে। হকের দাওয়াত পেশকারী যখন যুক্তিসংগত প্রমাণাদিসহ কারো সামনে সুস্পষ্টভাবে দাওয়াত পেশ করে এবং তার সন্দেহ–সংশয়, আপত্তি ও যুক্তি–প্রমাণের

জবাবও পেশ করে তখন সত্য প্রকাশ করার যে দায়িত্ব ও কর্তব্য তার ওপরে থাকে তা থেকে সে অব্যাহতি লাভ করে। এরপরও যদি সেই ব্যক্তি তার আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার প্রতি অটল থাকে, তার দায়-দায়িত্ব হকের দাওয়াত পেশকারীর ওপর বর্তায় না। এরপরও ঐ ব্যক্তির পেছনে লেগে থাকা, তার সাথে আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক করে নিজের সময় ব্যয় করা এবং কোন না কোনভাবে ঐ একজন মাত্র ব্যক্তিকে নিজের সমমনা বানানোকে নিজের একমাত্র কাজ মনে করা তার জন্য জরুরী নয়। এ ক্ষেত্রে দাওয়াত পেশকারী তাঁর কর্তব্য পালন করেছে। সে মানতে না চাইলে না মানবে। তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করার কারণে দাওয়াত পেশকারীকে এ অপবাদ দেয়া যাবে না যে, সে একজন মানুষকে গোমরাহীর মধ্যে ডুবে থাকতে দিয়েছে। কেননা, এখন সে নিজেই তার গোমরাহীর জন্য দায়ী।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ করে এ নিয়মটি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য এ নয় যে, তিনি দীনের তাবলীগের জন্য অনর্থক মানুষের পেছনে লেগে যেতেন। তাই আল্লাহ তাঁকে এ থেকে বিরত রাখতে চাইতেন। প্রকৃতপক্ষে একথা বলার কারণ হচ্ছে, ন্যায় ও সত্যের দিকে আহবানকারী যখন যথাসাধ্য সর্বাধিক যুক্তিসংগত পন্থায় কিছু লোককে বুঝানোর দায়িত্ব পালন করেন এবং তাদের মধ্যে হঠকারিতা ও ঝগড়াটে মনোবৃত্তির লক্ষণ দেখে তাদেরকে এড়িয়ে যান তখন তারা তাঁর পেছনে লেগে যায় এবং তাঁর প্রতি এ বলে দোষারোপ করতে থাকে যে, আরে ভাই আপনি তো দেখছি ন্যায় ও সত্যের আচ্ছা ঝাণ্ডাবাহী। কথা বুঝার জন্য আমরা আপনার সাথে আলোচনা করতে চাই। কিন্তু আপনি আমাদের দিকে ফিরেও দেখেন না। অথচ তাদের উদ্দেশ্য কথা বুঝা নয়, বরং নিজেদের উদ্দেশ্যমূলক বিতর্কের মধ্যে ন্যায় ও সত্যের দাওয়াত পেশকারীকে জড়ানো এবং শুধু তার সময় নষ্ট করাই তাদের লক্ষ্য হয়ে থাকে। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র কালামের মধ্যে সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, "এ ধরনের মানুষের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করো না, তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করায় তোমাকে তিরস্কার করা যেতে পারে না।" এরপর কোন ব্যক্তি একথা বলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দোষারোপ করতে পারতো না যে, আপনি তো আমাদেরকে আপনার দীন বুঝানোর জন্য আদিষ্ট। তা সত্ত্বেও আপনি আমাদের কথার জবাব দেন না কেন?

৫২. এ আয়াতে দীন প্রচারের আরেকটি নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে। ন্যায় ও সত্যের দাওয়াতের প্রকৃত উদ্দেশ্য সেসব পুণ্যাত্মাদের কাছে ঈমানের নিয়ামত পৌছিয়ে দেয়া, যারা এ নিয়ামতের মূল্য বুঝে এবং নিজেরা তা অর্জন করতে চায়। কিন্তু দাওয়াত পেশকারী জানে না মানব সমাজের লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে সেসব পুণ্যাত্মা কোথায় আছে। তাই তার কাজ হচ্ছে, ব্যাপকভাবে তার দাওয়াতের কাজ ক্রমাগত চালিয়ে যাওয়া। যাতে যেখানে যেখানে ঈমান গ্রহণ করার মত লোক আছে সেখানেই যেন তার কথা পৌছে যায়। এ লোকেরাই তার প্রকৃত সম্পদ। তাদের খুঁজে বের করাই তার মূল কাজ। এদের বাছাই করে এনে আল্লাহর রাস্তায় দাঁড় করানো তার লক্ষ হওয়া উচিত। মাঝ পথে আদম সন্তানদের যেসব বাজে উপাদানের সাথে তার সাক্ষাত হবে তাদের প্রতি ততক্ষণ পর্যন্ত তার মনোযোগ দেয়া উচিত যতক্ষণ সে অভিজ্ঞতা দ্বারা না জানবে যে, এগুলো বাজে জিনিস। তাদের বাজে ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী হওয়া সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর এ প্রকৃতির

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ﴿٥٩﴾ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٦٠﴾

জিন ও মানুষকে আমি শুধু এ জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার দাসত্ব[৫৩] *করবে। আমি তাদের কাছে কোন রিযিক চাই না কিংবা তারা আমাকে খাওয়াবে*[৫৪] *তাও চাই না। আল্লাহ নিজেই রিযিকদাতা এবং অত্যন্ত শক্তিধর ও পরাক্রমশালী।*[৫৫] *তাই যারা জুলুম করেছে*[৫৬] *তাদের প্রাপ্য হিসেবে ঠিক তেমনি আযাব প্রস্তুত আছে যেমনটি এদের মত লোকেরা তাদের অংশ পুরো লাভ করেছে। সে জন্য এসব লোক যেন আমার কাছে তাড়াহুড়ো না করে।*[৫৭] *যেদিনের ভয় তাদের দেখানো হচ্ছে পরিণামে সেদিন তাদের জন্য ধ্বংস রয়েছে।*

লোকদের পেছনে তাঁর মূল্যবান সময় নষ্ট না করা উচিত। কারণ, এরা তার উপদেশে উপকৃত হওয়ার মত মানুষ নয়। এদের পেছনে শক্তি ব্যয় করায় বরঞ্চ সেসব লোকের ক্ষতি হয় যারা এ উপদেশ দ্বারা উপকৃত হয়।

৫৩. অর্থাৎ আমি তাদেরকে অন্য কারো দাসত্বের জন্য নয় আমার নিজের দাসত্বের জন্য সৃষ্টি করেছি। তারা আমার দাসত্ব করবে এ জন্য যে, আমি তাদের স্রষ্টা। যখন অন্য কেউ এদের সৃষ্টি করেনি তখন তার দাসত্ব করার কি অধিকার এদের আছে? তাছাড়া তাদের জন্য এটা কি করে বৈধ হতে পারে যে, এদের স্রষ্টা আমি অথচ এরা দাসত্ব করবে অন্যদের!

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা শুধু জিন ও মানুষের স্রষ্টা নন। তিনি সমগ্র বিশ্ব-জাহান ও তার প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা। কিন্তু এখানে কেবল জিন ও মানুষ সম্পর্কে কেন বলা হয়েছে যে, আমি তাদেরকে আমার ছাড়া আর কারো দাসত্বের জন্য সৃষ্টি করিনি? অথচ গোটা সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণু শুধু আল্লাহর দাসত্বের জন্য। এর জবাব হচ্ছে পৃথিবীতে জিন ও মানুষই শুধু এমন সৃষ্টি যাদের স্বাধীনতা আছে। তারা তাদের ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের গণ্ডির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার দাসত্ব করতে চাইলে কিংবা তাঁর দাসত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে চাইলে নেবে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যদের দাসত্ব করতে চাইলেও করতে পারে। জিন ও মানুষ ছাড়া এ পৃথিবীতে আর যত সৃষ্টি আছে তাদের এ ধরনের কোন স্বাধীনতা নেই। তাদের আদৌ কোন ক্ষমতা ও ইখতিয়ার নেই যে, তারা আল্লাহর দাসত্ব করবে না অন্য কারো দাসত্ব করতে পারবে। তাই এখানে শুধু জিন ও মানুষ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা তাদের ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের গণ্ডির মধ্যে তাদের

নিজ স্রষ্টার আনুগত্য ও দাসত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে এবং স্রষ্টা ছাড়া অন্যদের দাসত্ব করে নিজেরা নিজেদের স্বভাব প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করছে। তাদের জানা উচিত যে, তাদেরকে একমাত্র স্রষ্টা ছাড়া আর কারো দাসত্বের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। তাদের জন্য সোজা পথ হচ্ছে যে স্বাধীনতা তাদেরকে দেয়া হয়েছে তার অন্যায় ব্যবহার যেন না করে। বরং স্বাধীনতার এ সীমার মধ্যে নিজ নিজ ইচ্ছা অনুসারে ঠিক তেমনিভাবে যেন আল্লাহর দাসত্ব করে যেভাবে তার দেহের প্রতিটি লোম তার ক্ষমতা ও ইখতিয়ার বিহীন সীমার মধ্যে তাঁর দাসত্ব করছে।

এ আয়াতে 'ইবাদাত' শব্দটিকে শুধু নামায রোযা এবং এ ধরনের অন্যান্য ইবাদাত অর্থে ব্যবহার করা হয়নি। তাই কেউ এর এ অর্থ গ্রহণ করতে পারে না যে জিন ও মানুষকে শুধু নামায পড়া, রোযা রাখা এবং তাসবীহ তাহলীল করার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। এ অর্থটিও এর মধ্যে শামিল আছে বটে, তবে এটা তার পূর্ণাংগ অর্থ নয়। এর পূর্ণাংগ অর্থ হচ্ছে, জিন ও মানুষকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের পূজা আনুগত্য আদেশ পালন ও বিনীত প্রার্থনার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। অন্য কোরো সামনে নত হওয়া, অন্য কারো নির্দেশ পালন করা, অন্য কাউকে ভয় করা, অন্য কারো রচিত দীন বা আদর্শের অনুসরণ করা, অন্য কাউকে নিজের ভাগ্যের নিয়ন্তা মনে করা এবং অন্য কোন সত্তার কাছে প্রার্থনার জন্য হাত বাড়ানো তাদের কাজ নয়। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাবার ব্যাখ্যা, টীকা ৬৩; আয যুমার, টীকা ২; আল জাসিয়া, টীকা ৩০)।

এ আয়াত থেকে আরো একটি অনুষাঙ্গিক বিষয় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। তা হচ্ছে জিনেরা মানুষ থেকে স্বতন্ত্র একটি সৃষ্টি। যারা দাবি করে মানব জাতিরই কিছু সংখ্যক লোককে কুরআনে জিন বলা হয়েছে, এর দ্বারা তাদের ধারণার ভ্রান্তি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে যায়। কুরআন মজীদের নিম্ন বর্ণিত আয়াতসমূহও এ সত্যেরই অনস্বীকার্য প্রমাণ পেশ করে। (আল আন'আম, ১০০, ১২৮; আল আ'রাফ, ৩৮, ১৭৯; হূদ, ১১৯; আল হিজ্‌র, ২৭ থেকে ৩৩; বনী ইসরাঈল, ৮৮; আল কাহ্‌ফ, ৫০; আস সিজদা, ১৩; সাবা, ৪১; সাদ, ৭৫ ও ৭৬; হা-মীম আস সাজদা, ২৫; আল আহক্বাফ ১৮; আর রহমান ১৫, ৩৯, ৫৬; (এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল্ আম্বিয়া, টীকা ২১; আন নামল, টীকা ২৩, ৪৫; সূরা সাবার ব্যাখ্যা, টীকা ২৪)

৫৪. অর্থাৎ জিন ও মানুষের কাছে আমার কোন উদ্দেশ্য বাঁধা পড়ে নেই যে, এরা আমার দাসত্ব করলে আমার প্রভুত্ব চলবে আর এরা আমার দাসত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে আমি আর আল্লাহ থাকতে পারবো না। আমি তাদের বন্দেগী বা দাসত্বের মুখাপেক্ষী নই। বরং আমার বন্দেগী করা তাদের প্রকৃতির দাবি। এ উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। নিজ প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করা তাদের নিজেদেরই ক্ষতি।

"আমি তাদের কাছে রিযিক চাই না, কিংবা তারা আমাকে খাবার দান করুক তাও চাই না" একথাটির মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ইংগিত আছে। আল্লাহবিমুখ লোকেরা পৃথিবীতে যাদের বন্দেগী করছে তারা সবাই প্রকৃতপক্ষে এসব বান্দার মুখাপেক্ষী। এরা যদি তার প্রভুত্ব না চালায় তাহলে তা একদিনও চলবে না। সে এদের রিযিক দাতা নয় এরাই বরং তাকে রিযিক পৌছিয়ে থাকে। সে এদের খাওয়ায় না, এরাই তাকে খাইয়ে থাকে। সে এদের প্রাণের রক্ষক নয়, বরং এরাই তাদের প্রাণ রক্ষা করে থাকে। এরাই তাদের সৈন্য

সামন্ত। এদের ওপর নির্ভর করেই তাদের প্রভুত্ব চলে। যেখানেই কেউ এ মিথ্যা প্রভুদের সহযোগী বান্দা হয়নি কিংবা বান্দারা তাদেরকে সহযোগিতা করা থেকে বিরত থেকেছে সেখানেই তাদের সব জৌলুস হারিয়ে গিয়েছে এবং দুনিয়ার মানুষ তাদের পতন দেখতে পেয়েছে। সমস্ত উপাস্যের মধ্যে একমাত্র মহান ও মহা পরাক্রমশালী আল্লাহই এমন উপাস্য, নিজের ক্ষমতায়ই যাঁর প্রভুত্ব চলছে। যিনি তাঁর বান্দাদের নিকট থেকে কিছু নেন না, বরং তিনিই তাদের সবকিছু দেন।

৫৫. মূল আয়াতে مَتِيْن শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ দৃঢ় ও অটল যা কেউ নড়াতে পারে না।

৫৬. এখানে জুলুম অর্থ বাস্তব ও সত্যের প্রতি জুলুম করা এবং নিজে নিজের প্রকৃতির প্রতি জুলুম করা। পূর্বাপর প্রসংগ থেকে একথা প্রকাশ পাচ্ছে যে, এখানে জুলুম-নির্যাতনকারী বলতে সেসব মানুষকে বুঝানো হয়েছে যারা বিশ্ব-জাহানের রবকে বাদ দিয়ে অন্যদের দাসত্ব করছে, যারা আখেরাত অস্বীকার করছে, পৃথিবীতে নিজেদেরকে দায়িত্ব মুক্ত মনে করছে এবং সেসব নবী-রসূলদের অস্বীকার করছে যারা তাদেরকে প্রকৃত সত্য সম্পর্কে সতর্ক করার চেষ্টা করেছেন।

৫৭. কাফেররা দাবি করে বলতো যে, সে প্রতিফল দিবস আসার পথে কোথায় আটকে গেল, তা এসে পড়ছে না কেন? এটা কাফেরদের সে দাবিরই জবাব।